ঝরা পালক

ঝরা পালক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

ঝরা পালক

প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন, ১৩৪৪

মূল্য—পাঁচ সিকা

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

অধিকাংশ গল্পই কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা। কোনোটি শুদ্ধ ভাষায় কোনোটি বা চলতি বাংলায় লেখা। সবগুলিই আট বছর আগে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্রশিল্পী অধ্যাপক ললিতমোহন সেন

করকমলেষু।

সূচী

ঝরা পালক

ঝরা পালক

১

ফুটবল ম্যাচ দেখার বাতিক আমাদের দু'পুরুষের। বাবা আপিসের পর খেলা না দেখিয়া বাড়িতে ফিরিতেন না, সেই নেশাই তাঁহার কাল হইল। শেষবার সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া খেলা দেখিয়া বাড়িতে ফিরিলেন। সেই রাত্রেই কম্প দিয়া জ্বর আসিল, দশদিনের দিন মারা গেলেন, কলিকাতার বড় ডাক্তারেরাও একত্রে মিলিয়া তাঁহাকে যমের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিলেন না। আমিও এ বিষয়ে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। সেদিন ম্যাচের পরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খেলোয়াড়দের খেলার সমালোচনা, বিদেশি আম্পায়ার-এর জজিয়তির উপর জজগিরি করিয়া গড়ের মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম। খিদিরপুরে আমার বাড়ি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গড়ের মাঠের অন্ধকারের বুকে গ্যাসের আলোর হীরার মালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশে বড় রাস্তার উপর দিয়া যখন যাইতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম একটা ষণ্ডাগোছের লোক,

একটি জাপানী স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। রমণী তাহার হাত ছিনাইয়া লইতেই সে যেমনি আবার তাহার হাত ধরিতে গেল, অমনি স্ত্রীলোকটি তাহার মোড়া জাপানী ছাতাটি দিয়া সজোরে তাহার মুখে আঘাত করিল। আমি সম্মুখে আসিয়া পড়াতে লোকটি সরিয়া দাঁড়াইল এবং পর মুহূর্ত্তেই উর্দ্ধশ্বাসে মাঠের ভিতর ছুটিয়া পলাইয়া গেল। চিলের ছোঁ'র হাত হইতে কপোতটি আমার হাতে পড়িল। আমি তাহাকে ইংরাজিতে আশ্বাস-বাণী শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বাড়ি কোথায়? যুবতী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কি যে বলিল, একটি বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। তাহাকে ইসারা করিয়া বড় রাস্তার উপর আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলাম। সে আমার পিছু পিছু আসিল। আসিল তো, কিন্তু ইহাকে লইয়া কি করিব? মনে মনে স্থির করিলাম, বাড়িতে লইয়া যাই, তাহার পর দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করা যাইবে। ঘাড়ের উপর যখন পড়িল তখন ফেলিয়াই বা যাই কেমন করিয়া? অল্পক্ষণ পরেই পাশ দিয়া আস্তে আস্তে একখানা ট্যাক্সি যাইতেছিল। আমি হাত তুলিয়া ইসারা করিতেই ঘুরিয়া আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল। দরজা খুলিয়া দিয়া ভাষাহীন সসম্ভ্রম ইঙ্গিতে মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে উঠিতে অনুরোধ করিলাম। সে একবার তার ছোট ছোট চোখ দুটি তুলিয়া আমার মুখের পানে তাকাইল, তাহার পর ট্যাক্সির ভিতর উঠিয়া বসিল। উঠিবার ভঙ্গীটি যেমন লঘু তেমনি মধুর। নিঃশব্দে দুজনে পাশাপাশি বসিলাম, ট্যাক্সি আমার নির্দ্দেশ মত খিদিরপুর অভিমুখে চলিল।

২

যথাসময়ে মোটরখানি আমাদের বাড়ির গাড়িবারাণ্ডায় গিয়া ঢুকিল। মেয়েটিকে নামাইয়া সটান্ ড্রইং-রুমে লইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিয়া

উপরে গেলাম। দাদা ব্যারিষ্টার—তখনও কোর্ট হইতে ফিরেন নাই। বৌদি আমার ছোট বোন লীলার সঙ্গে "ক্যারম্" খেলিতেছেন, এ খেলাটি তিনি পিত্রালয় হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং সংক্রামক রোগের মত আমাদের বাড়ির ছোট-বড় সকলের আঙুলের ডগায় ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি বৃদ্ধা পিসীমা পর্য্যন্ত বাদ পড়েন নাই। বৌদিকে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলাম। তিনি আর লীলা তো খেলা ফেলিয়া নীচে ছুটিলেন, আমিও পিছন পিছন গেলাম।

বৌদিদিকে দেখিয়া জাপানী মেয়েটি একটু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জানুর উপর হাত দুখানি রাখিয়া জাপানী ভঙ্গীতে কুর্ণীশ করিল।

বৌদি আমার মুখেই শুনিয়াছিলেন যে, সে ইংরাজি হিন্দী কিছুই বোঝে না। সুতরাং তাহার থুৎনিটি ধরিয়া দিব্যি ঘাড় নাড়িয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, আমার ঠাকুরপোকে পছন্দ হয়?" আর আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, "কাল একখানা জাপানী প্রথম ভাগ কিনে মুখস্থ কোরো।" তারপর তাহার পাশে বসিয়া তাহার হাতখানি আপনার হাতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বাঃ, কি মিষ্টি হাতখানি, যেমন নরম, তেমনি সুন্দর, আঙুলগুলি যেন চাঁপার কলি।" লীলাকে বলিলেন, "যা, শিগগির চা করে নিয়ে আয়।" তারপর মেয়েটিকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছু খাইবে কি না। সে একটু মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কি বলিল বুঝিলাম না বটে, কিন্তু তার ঝক্‌মকে দাঁতগুলি লাল মাড়ি আর টুক্‌টুকে ঠোঁট দু'খানির উপর শুভ্র জ্যোৎস্নার ক্ষীণ আভা যেন ছড়াইয়া দিল। মোটরের শব্দ গাড়ি-বারাণ্ডায় শোনা গেল। বুঝিলাম দাদা আসিয়াছেন। আমি ছুটিয়া গিয়া দাদাকে খবর দিতে যাইতেছিলাম, বৌদি আমাকে বারণ করিলেন, —"থাক্ না, উনি ঘরে এসেই দেখবেন অখন, এর পর তো আর ভাশুর-ভাদ্রবৌয়ে দেখা হবে না।" আমি বল্লাম, "বৌদি, আমার উপর

তো খুব একহাত নিচ্ছ, কিন্তু দাদা এসে যদি আমার জন্য আর একটি ছোট বৌদির ব্যবস্থা করেন, তাতে তোমার কোনো আপত্তি নাই তো?" বৌদি ঘাড় নাড়িয়া সদর্পে বলিলেন, "কিছুমাত্র না।"

দাদা কোর্ট হইতে আসিয়া বরাবর তিন লাফে উপরে ওঠেন। ড্রয়িং রুমে আলো দেখিয়া সেই ঘরে ঢুকিয়াই জাপানী মেয়েটিকে সাম্‌নে দেখিতে পাইলেন, তারপর একবার বৌদির, একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। বৌদি দাদাকে বলিলেন, "উনি অনেকক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে বলছেন।" এই বলিয়া কতকটা যেন গম্ভীরভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমি অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। দাদা একটু যেন অবাক হইয়া মেয়েটিকে প্রশ্ন করিলেন, "আমি জান্‌তে পারি কি মহাশয়ার এখানে কি নিমিত্তে আগমন?" মেয়েটি দাদার দিকে চাহিয়া মুখের কাছে হাত তুলিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ছোট একটি চা-র ট্রে লইয়া বৌদিদি ঘরে ফিরিলেন, লীলা সেই সঙ্গে আসিয়া মেয়েটিকে ইংরেজিতে বলিল, "আমার সঙ্গে এস, একটু হাতমুখ ধুয়ে নেবে।" এই বলিয়াই তাহাব হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল। মোটা কাঠের স্যাণ্ডেল-পরা পা দুখানি চক্‌চকে মেঝের উপর দিয়া যেন আলগোছে ঠেকাইয়া চলিয়া গেল, পুতুল-নাচের পুতুল যেমন করিয়া চলিয়া যায়। সত্যই তাকে মস্ত একটি 'ডলের' মতই মনে হইতেছিল আলোকোজ্জ্বল ঘরে।

বৌদি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলে ওর কথা?"

দাদা একটু অবাক্ হইয়া বলিলেন, "কিছুই তো বলেনি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি জন্যে এখানে এসেছে, কিন্তু উত্তর দেবার আগেই তো লীলা ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বৌদি। তুমি বিলাত থেকে ফিরবার সময় আমেরিকা আর জাপান হয়ে ফিরেছিলে, না ?

দাদা। হাঁ, তাতে কি ?

বৌদি। জাপানে থাক্‌বার সময় কারু সঙ্গে প্রেমে পড়োনি তো ?

দাদা। কেন ? ও তাই বল্‌ছিল নাকি ?

বৌদি। ধর, যদি বলেই থাকে ?

দাদা একটু যেন থতমত খাইয়া জোর করিয়া বলিলেন, "ধরব আবার কি ? যদি বলে থাকে ত মিথ্যে কথা বলেছে। ওকে আমি কখনো দেখিওনি।

বৌদি। সব জাপানীরই তো এক রকম চেহারা। ঠিক ওর সঙ্গে না হোক, আর কারুর সঙ্গে তা হোলে—

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "ব্যারিষ্টারকে জেরা করা হচ্ছে, সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজি ! যদি বলি, হাঁ ?"

বৌদি। তোমরা সত্যি কথা বলো ?

দাদা। তোমরা মানে ? আমরা ব্যারিষ্টাররা, না পুরুষরা ?

বৌদি। তুমি ব্যারিষ্টারও বটে, পুরুষও বটে।

দাদা। তবে বহুবচন ব্যবহার করলে কেন ?

বৌদি। গৌরবে, 'গৌরবাৎ বহুবচনং' ব্যাকরণে লেখে না ?

এমন সময় লীলা আর সেই জাপানী মেয়েটি ঘরে ঢুকিল, দাদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় লীলা হাসিয়া বলিল, "বড়্‌দা, বৌদি কি বলছিল জানো ? এই কুড়ানির সঙ্গে ছোটদার বিয়ে দেবে !"

দাদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি বল্‌ ত ? তোরা সবাই মিলে আমাকে ত দেখছি দিব্যি "এপ্রিল ফুল" বানিয়ে দিলি !" বৌদি বলিলেন, "আচ্ছা, আগে এই জাপানী ফুলটিকে একটু খাইয়ে নি,

তারপর আবার তোমায় জেরা সুরু করব।" এই বলিয়া চা ঢালিতে ঢালিতে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জন্য এক পেয়ালা ঢালি?"

দাদা বলিলেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, ডিয়ার।"

বৌদি নিজের জন্যও এক পেয়ালা ঢালিলেন, আর আমাদের বলিলেন, "ডিনারের আর দেরী নেই, তোদের এখন আর চা খেয়ে কাজ নেই।"

৩

দাদা আর আমি মেয়েটিকে লইয়া খিদিরপুরের থানায় গেলাম। একজন সাহেব দারোগা ছিলেন। সমস্ত ঘটনা আমার মুখে শুনিয়া খাতায় টুকিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর কোনো গহনা রিষ্ট-ওয়াচ ইত্যাদি সে কাড়িয়া লইয়াছে কি না? সে-কথা ও কিছু বলিয়াছে কি? দাদা তাঁহাকে বলিলেন, "কোনো কথাই ত বলতে পারে না দেখ্‌ছ।" সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইসারা ইঙ্গিতে কিছু জানিয়েছে কি?" আমি বলিলাম, "না।"

দারোগা সাহেব মেয়েটির ভার লইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়া অব্যাহতি দিলেন। দাদা আমাদের বাড়ীর 'ফোন্' নম্বর দিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিলেন যে, মেয়েটি যথাস্থানে পৌছিল কিনা যেন তাঁহাকে জানান হয়। পরদিবস সমস্তদিন কোনো খবর পাইলাম না। ইচ্ছা হইল একবার থানায় গিয়া খবর লইয়া আসি। আমার এ অনুসন্ধিৎসার মূলে শুধুমাত্র কৌতূহল ও কুশলকামনা ছাড়া আর কিছু ছিল কিনা জানি না। আমি এম-এসসি পড়ি, ফুটবল ম্যাচ দেখি, 'সাইকলজির' ধার ধারি না। তবে মেয়েটির মুখের ভাবে ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে বড় একটা

লালিত্য ছিল। সে যদি কুরূপা হইত, তাহা হইলে কি তাহার সম্বন্ধে এতখানি আগ্রহ বা মমতা আমার মনে জাগিত? তাহা হইলে কি গড়ের মাঠ হইতে ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিতাম? মন বলিল, বোধ হয় আনিতাম, না আনিলে আপনাকে অশ্রদ্ধাই করিতাম। আমার প্রশ্নকর্ত্তা আমাকে বিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু ওই 'বোধ হয়' কথাটি তাহার কানে ভাল লাগে নাই। আমি তাহাকে বলিলাম, "দেখ, বিরক্ত হোয়ো না। সুন্দরের একটা বিধিদত্ত ক্ষমতা আছে এই যে, যাকে খাটিয়ে নেয় সে খুশী হয়েই খাটে এবং এই খাটতে পারার অধিকারটুকুই সানন্দে মজুরীস্বরূপ গ্রহণ করে। সুতরাং এই বিপন্ন মেয়েটিকে সাহায্য করতে গিয়ে, তার উদ্ধারের আনন্দটুকুর উপর তার রূপের আভা একটুখানি যদি পড়েই থাকে সেজন্য তোমার ভ্রূকুঞ্চনটি আমাকে না দেখালেও পারতে।" সে বলিল "বাপু হে, তোমার কাছে আমার ঢাক্ ঢাক্ গুড়গুড় নেই। তোমার ভালোর জন্যই দু'একটা স্পষ্ট কথা বলি, রাগ না করে শোনো যদি, সময়-অসময়ে কাজে লাগবে।"

পরদিন সকালে দাদার আফিস-ঘরে বসিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পড়িতেছি। দাদা স্নান করিতে গিয়াছেন, সকাল সকাল কোর্টে যাইবেন, দাদা বাহির হইয়া আসিলে আমি স্নানে যাইব। এমন সময় তাঁহার টেবিলে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। আমি উঠিয়া ধরিলাম। খিদিরপুর থানা হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সুরেশবাবু আছেন?" আমি বলিলাম "আমিই সুরেশবাবু, কি বলুন।" উত্তর, "পরশু যে জাপানী মেয়েটিকে আপনি থানায় রেখে এসেছিলেন সে নিজের বাসায় নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে। আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। তার ঠিকানা ৮নং কলিঙ্গাবাজার ষ্ট্রীট।" আমি সংবাদটা কাহাকেও দিলাম না। ভাবিলাম, দেখিয়া আসি তাহার পর বলিব।

৪

সেদিন একটা ভারী-গোছের 'ম্যাচ' ছিল। কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিয়া কলেজের পর ট্রামে চড়িলাম ৮নং বাড়ীর সন্ধানে। বাড়ীটি বাহির করিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না, দরজা বন্ধ, কড়া নাড়িলাম। একটি মোটাগোছের আধাবয়সী জাপানী স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "What want Babu?" অর্থাৎ তোমার কি চাই বাবু? আমি বলিলাম, "একটি জাপানী মহিলাকে আমি পরশু খিদিরপুর থানাতে রেখে এসেছিলাম। থানা থেকে 'ফোন্' করেছে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"ও বুঝেছি—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আচ্ছা ভিতরে আসুন।" এবার কথার স্বরটি খাদে নামিয়াছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমাকে পাশের ড্রইং-রুমে বসাইয়া সেই মেয়েটিকে আনিতে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, সে আমাকে জাপানী-ধরণে নমস্কার করিল, আমিও যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া প্রত্যভিবাদন করিলাম, সে তার সঙ্গিনীকে আপনার মাতৃভাষায় কি বলিল। জ্যেষ্ঠা বলিল,—আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছে এবং বলিতেছে আপনাকে তাহার অদেয় কিছুই নাই।"

শেষ কথাটির অর্থ কি তাহা দোভাষিনীর হাস্যপূর্ণ অর্থগর্ভ হাসিতে ও মুখের ভাবে বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি বলিলাম উহাকে বল, সে যে আপনার আশ্রয় স্থানে পৌঁছিয়াছে ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।—এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। মেয়েটি

আমার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, তাহার আল্‌খাল্লার বুকের ভাঁজ হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া আমার হাতে দিল এবং মৃদুস্বরে কি যেন বলিল। কথা বুঝিলাম না, কিন্তু দেখিলাম, তাহার চোখে মুখে, সর্ব্বাঙ্গে একটা করুণ মিনতি উথলিয়া উঠিল।

প্রৌঢ়া আমাকে বলিল, "ও আজ দু'দিন ধরে প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে এই ছবিখানা এঁকেছে আপনাকে দেবার জন্যে।" ভাবিলাম যে এরূপ স্থান হইতে উপহার গ্রহণ করা নীতিবিগর্হিত হইবে কিনা। কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে কখন অতর্কিতে হাত বাড়াইয়া নিলাম এবং দ্রুতপদে সে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম তা যেন আমার খেয়ালে আসে নাই। ট্রামে বসিয়া ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিলাম।

ছবিখানি এই। একটা সিন্ধু-সারসকে এক শিকারী গুলি মারিয়াছে। তীরে পাথরের উপর একজন লোক বসিয়াছিল। পাখীটি মরণাহত হইয়া তাহার মাথার উপর দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, উড়িয়া যাইবার সময় তাহার রক্ত লোকটির শুভ্র বসনের উপর পড়িল, আর উড়িয়া আসিয়া পড়িল একটি ঝরা পালক। ছবির কোণে জাপানী ভাষায় কয়েক ছত্র লেখা।

৫

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনার কথা কাহাকেও বলিলাম না। রাত্রে ডিনারের সময় বৌদি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে জাপানী মেয়েটির কোনো সংবাদ তিনি থানায় যাইয়া লইয়াছিলেন কিনা। বৌদি তাহার জন্য বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং বিশেষ করিয়া দাদাকে খোঁজ নিতে বলিয়াছিলেন। দাদা বলিলেন, "কাল ভুলে গিয়েছিলাম, আজ কোর্ট থেকে ফিরবার পথে থানা হয়ে এলাম, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই।

মেয়েটি সম্প্রতি জাপান থেকে এসেছে। সে জাহাজ এখনও তক্তাঘাটে নোঙর করা আছে। হতভাগিনীকে কলকাতার জাপানী নরকে আশ্রয় দেবার জন্যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে দালাল একটি ভৃত্যের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। ট্যাক্সি-ওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করে, লোকটা মেয়েটিকে রেস কোর্সের পাশে নামিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য পথ থেকে কোন কাপ্তেন সংগ্রহ করে কিছু অর্থোপার্জ্জন করা। ট্যাক্সিওয়ালা অদূরে অপেক্ষা করছিল এবং সেই ট্যাক্সি ভাড়া করে স্থরেশ ওকে বাড়ী এনেছিল। পুলিশের লোক তার নাম রেজেষ্টারী করে তাকে যথাস্থানে পৌছে দিয়েছে। বৌদিদির মুখ শুকাইয়া গেল, দাদা বলিলেন, "এখন ফেনাইল্ আর গঙ্গাজল দিয়ে তোমার ঘরদোর ধুয়ে ফেল, আর পেয়ালা-পিরিচগুলো ফেলে দাও।" বৌদি বলিলেন, "আমি তোমার বাড়ীর শুদ্ধির কথা ভাবছি না, ভাবছি মেয়েটার কি দশা হ'ল! অমন ফুলের মতন মুখখানি!" ঝর ঝর করিয়া তাঁহার দু'চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দাদার কথাটা তাঁহাকে আঘাত দিয়াছিল, সেদিন খাওয়ার টেবিলের উপর একটা বিষাদের মেঘ ঘনাইয়া রহিল।

জাপানী কন্‌সলেটে গিয়া সেখানকার বড় সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইয়া দেখা করিলাম। সবিনয় ভূমিকা সহকারে জানাইলাম যে আমার কাছে একখানা জাপানী ছবিতে কয়েকটি লাইন জাপানী ভাষায় লেখা আছে, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহার মর্ম্ম আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। লোকটি বেঁটেসেটে, পরণে সাদা স্থট, চোখে রিম্‌লেস্ চশমা, স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া ছোট দুটি হাসিভরা উজ্জ্বল চোখ, আমার কথা শুনিয়া কৌতূহলে আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমি ছবিখানি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি চশমা খুলিয়া ছবিটা কাছে লইয়া দেখিলেন। তারপর আবার চশমাটি পরিয়া একটু দূরে রাখিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন। অবশেষে

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় এ ছবিখানা পাইলাম এবং আমি উহা বিক্রী করিতে রাজি কিনা। তাঁর প্রশ্নের শেষাংশের উত্তরে বলিলাম, "না"। কোথায় পাইয়াছি বলিতে রাজি হইলাম না, কিন্তু লাইনগুলির অর্থ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনাকে বলব।" এই বলিয়া একটুকরো কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলেন, কিন্তু কলম তেমন দ্রুত চলিল না। লেখা রাখিয়া আমাকে তাঁর ভাঙা ইংরাজিতে মোটামুটি ছবি-খানা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন, ছবি-খানার ভিতরই সব কথা আছে, আর লাইন কয়টি কেবল তাহারি একটু ধ্বনিমাত্র। ভাবটা যাহা বুঝিলাম তাহা, "আমার শুভ্রতম পালকটি তোমাকে দিলাম।"

আমি তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া উঠিতে যাইব, এমন সময় আমাকে একটা 'সিগারেট' নিবেদন করিয়া বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে ছবিখানি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি তিনি তাহা জানিতে উৎসুক। আমি আদ্যোপান্ত চিত্র-লেখিকার বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি সহর্ষে আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আমি জাপানের তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি" এবং সেই মেয়েটির বাসার ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

৬

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বৌদিকে ছবিখানি দেখাইলাম এবং জাপানী কন্‌সালের সহিত দেখা করিবার কথা বলিলাম। বৌদিদি কবিতা লিখিতেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিলাম, তিনি যদি ওই ছবিখানির পিছনে জাপানী লিপির মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দু লাইন লিখিয়া

দেন। বৌদিদি ছবিখানা তাঁহার কাছে রাখিলেন। পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বৌদি এই লাইন কয়টি লিখিয়া রাখিয়াছেন।—

"ডুবিনু অতলে বক্ষে ধরি মৃত্যুবাণ,
শুভ্রতম পালক আমার
ভেসে গেল চরণে তোমার,
নিঃশ্বাস-বায়ুতে মোর অন্তিমের দান।"

বৌদি ছবিখানা রাখিয়া দিলেন, দাদাকে দেখাইবার জন্য।

* * * *

তিন মাস পরে আমার নামে, জাপানী শীলমোহরাঙ্কিত একখানা চিঠি আসিল। কন্‌সাল্ আমাকে যা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, সে মেয়েটিকে জাপানে ফেরত পাঠান হইয়াছে। সে এখন জাপান গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিধারিণী, সেখানকার চিত্র-বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বৌদিকে চিঠিখানা দেখাইলাম। আনন্দে তাঁর মুখে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, আর চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "হায়, আমাদের দেশের হতভাগিনীদের জন্যে এরকম ব্যবস্থা কে কবে করবে?"

গোপাল দা

গোপাল দা অকৃতদার। অনেক অপেক্ষার পর একে একে ছোট ভাইগুলি তাঁহাকে ডিঙাইয়া বিবাহ করিয়া ঘর সংসার পাতিয়াছে। বৃদ্ধ বাপ-মা যতদিন জীবিত ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। গোপাল দা এখন বাড়ির কর্ত্তা। দাদার ব্রাহ্মণী, 'হারেম' বলিলেই ঠিক বলা হয়, হইতেছেন তাঁহার লাইব্রেরী। এই ষোড়শ সহস্র গোপিনীর তিনিই মাধব, অধ্যয়ন তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়ি, অর্থাভাব নাই। অন্যান্য ভ্রাতারা কেহ চাকুরী করেন, কেহ ডাক্তারি করেন ইত্যাদি। পিতা উকিল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে মক্কেলসহ নিজের ব্যবসায়টি দিয়া যাইবেন বলিয়া পুত্রকে সযত্নে প্রথম যৌবনে লেখাপড়া শিখাইয়া ছিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। গোপাল দা বি, এ, পাশ করিয়া এম্, এ, না দিয়াই বি, এল দিলেন। সকল পরীক্ষাগুলিই গৌরবের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে পরীক্ষার পড়া অপেক্ষা সাহিত্য ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। এটিও পৈতৃক রোগ। পিতাপুত্রে একসঙ্গে কাব্যালোচনা হইত। দৃশ্যটি আমাদের দেশে দুর্লভ, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। গোপাল দার পিতাকেও নিরাশ হইতে হইয়াছিল। তিনি স্বহস্তে যে তরুণ শিবমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধুদের চক্ষে যেন লাঙ্গুলসহ দেখা দিল। তাঁহারা বলিলেন, "এ যে শিব গড়তে বাঁদর গড়ে তুললে।" তবে এ শাখা-মৃগটি সাহিত্যের পল্লবে পল্লবেই ঝুলিয়া বেড়াইত।

ইহার আর কোন দৌরাত্ম্য অন্ততঃ লোক-চক্ষে পড়ে নাই। পিতার দুঃখ, সে আইনের ডিগ্রি পাইল বটে কিন্তু উকীল হইল না, তাঁহার মুখাগ্নি ও পিণ্ডের সদ্ব্যবস্থা করিল না। গৃহীর সংসারে সন্ন্যাসের আসন পাতিয়া "যথারণ্যং তথাগৃহং" করিয়া তুলিল। পিতার এ দুঃখ তত অসহনীয় হইত না, যদি গোপাল দার মাতা এত আকুল হইয়া তাঁহার স্বামীকে অস্থির করিয়া না তুলিতেন। যাহা হৌক, সে পূর্ব্বকাহিনী আজ আর অধিক বলিব না। গোপাল দা'র আত্মকথা কিঞ্চিৎ বলিতে চাই। সেদিন লাইব্রেরীতে আমরা কয়েকজন তাঁহার ছোট বড় ভক্তবৃন্দ দিব্য আসর জমকাইয়া বসিয়াছিলাম। ইংরেজি কবিতা পাঠ, ফরাসী কবিতার আবৃত্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি মধুর ইংরাজি তর্জ্জমা করিয়া তিনি আমাদের বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছিলেন। প্রেমের কবিতায় তাঁহার নেশাটা একটু ভাল করিয়া জমে। পড়িতে পড়িতে একেবারে অধীর হইয়া উঠেন, মাঝে মাঝে দরদরধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

একটি ফরাসী কবিতার আবৃত্তি করিয়া তর্জ্জমা শুনাইয়া গোপাল দা ভাবের আতিশয্যে এবং বহু আবৃত্তির পরিশ্রমে হাঁফাইয়া, দম লইবার জন্য একটু থামিলেন। অনেক দিনের কথা—কবির নাম ও কবিতাটি ঠিক স্মরণ নাই। তবে ছবিখানি কতকটা এই রকম—আকাশে ঘন মেঘের জটলা। তুষার প্রান্তর যেন দিগন্ত বিস্তৃত। অভিসারিণী পথচিহ্ন-লেশহীন পথিক-বিহীন তুষার সাহারা উত্তীর্ণ হইয়া প্রিয়ের বক্ষে গিয়া পৌঁছিল। তাহার চূর্ণালকে হিমকণা মুক্তা রচনা করিয়াছে, বিম্বাধরে মরণের পাণ্ডুরতা, প্রিয়তমের বুকে সীমন্তের তুষার গলিল, পাংশু অধরে আবার রক্তরাগ ফিরিয়া আসিল। পাঠান্তে গোপাল দার মুখের ভাবখানা এইরূপ, যেন কবির জবানীতে তিনি আপনার অভিজ্ঞতার কথাই বলিলেন এবং সদ্য জাগরিত পূর্ব্বস্মৃতির আমেজ তাঁহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। সম্মুখের জানালার ভিতর দিয়া মুক্ত

আকাশের দিকে তিনি যেরূপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহাতে মনে হইল যেন অভিসারিকার মূর্ত্তিটি সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি গোপাল দার এই সমাধিস্থ ভাবটা, একটু মুখফোড় হইয়া ভাঙিয়া দিয়া বলিলাম, "কাল রমেশবাবু কি বলছিলেন জানেন?" গোপাল দা একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইষ্টু পিটু বল্‌ছিল কি? হাসির মধ্যে বোধ করি রমেশ বাবুর কাছে মন খুলিয়া বলা কোনও কথার স্মৃতি প্রচ্ছন্ন ছিল। আমি বলিলাম, "বল্‌ছিলেন যে আপনি নাকি অনেকবার প্রেমে পড়েছেন?"

গোপাল দা, আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া উঠিয়া গিয়া পাখার স্থইচটা টিপিয়া দিলেন। বিজলি পাখার ঘূর্ণী নৃত্যে অকস্মাৎ উৎক্ষিপ্ত চঞ্চল বাতাসটি বড় মধুর লাগিল। তাহার ঘর্ম্মাক্ত পিরাণটা খুলিয়া, চটিজুতা হইতে পা তুলিয়া চেয়ারে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন এবং হাঁকিলেন—"ফটিক!" "আজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিয়াই সে আসিয়া হাজির। "একগ্লাস জল খাওয়াতো বাবা; আর বাবুদের জন্যে চা নিয়ে আয়।" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল্‌তে গেলেই পড়তে হয়, না পড়ে কে চলতে শিখেছে ভাই।"

শুনিয়াছিলাম তিমি মাছের ল্যাজে চিমটি কাটিলে সে সংবাদটা তার মস্তিষ্কে পৌছিতে নাকি প্রায় আট সেকেণ্ড লাগে। বুঝিলাম, এতক্ষণে আমার কথাটা দাদার মগজে গিয়া হাজির হইয়াছে। আমি কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে শ্রীশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "গোপালদা, আপনি প্রথম প্রেমে পড়েন কোন্ বয়সে?"

"আমার প্রথম প্রেমে পড়ার ইতিহাস শুন্‌তে চাও? আচ্ছা বল্‌ছি শোন।"

গোপালদা'র কথা

আমার বয়স তখন সাত কি বড় জোর সাড়ে সাত হবে—আমাদের

এ বাড়ির জায়গা সবে কেনা হয়েছে মাত্র, আমরা তখন ভবানীপুরে থাকি। ছোট ভাইদের মধ্যে তখন কেবল ছটুকু হয়েছে, আমরা এক বছরের ছোট বড়। বাসার কাছে পদ্মপুকুর লেনে এক মিশনারী স্কুল ছিল। আমাদের প্রথম তিন ভাই বোনের হাতেখড়ি সেইখানে। দিদি উপরের ক্লাসে পড়তেন, আর বছর বছর প্রাইজ পেতেন। তাই দেখে আমার সখ হল আমিও স্কুলে যাব। দুরন্ত ছেলে, বাড়িতে মাষ্টার মশাই ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমাকে সামলাতে পারতেন না, একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতেন। সুতরাং আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যখন স্কুলে যাবার বায়না ধরলাম, কেউই তাতে আপত্তি করলেন না—আমাকে স্কুলে সব নীচের ক্লাসে ভর্ত্তি করে দেওয়ার কথা হল। আমার দেখাদেখি আমার ছোট ভাইটিও স্কুলে যাবার জন্য নেচে উঠল। দুই ভাই একদিনে এক ক্লাশে ভর্ত্তি হলাম।

ঘণ্টা পড়ল। প্রথম ক্লাসে বসে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি। এমন সময় একটি 'মেম' সাহেব এসে চেয়ারে বসলেন। তিনি আমাদের 'মেরী টিচার'। আমাদের নূতন ছাত্র দেখে কাছে উঠে এলেন। পাশে একটি মেয়ে (নীচের ক্লাসে ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে পড়ত) বলে উঠল, "ওরা বিধু দিদির ভাই।" মেরী টিচার হেসে বল্লেন, "তাই নাকি?" দিব্যি বাংলা বলেন। সেই মিষ্টি কথার রেশটুকু এখনও কানে লেগে আছে। আমাকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। বল্লেন "তুমি বুঝি বড়?" তারপর আমার ছোট ভাইটির গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি ধন?" আমার হিংসা হল। কারণ প্রথম দেখাতেই তাঁকে বড় ভাল লেগেছিল। তিনি যে আমার ভাইটির চেয়ে আমার প্রতি ব্যবহারের একটুকু তারতম্য করেছিলেন, তাই ঐ হিংসা। তারপর তিনি চেয়ারে বসে আমাদের A B C D পড়াতে আরম্ভ করলেন। আমি তাঁর গলার স্বর ও মুখের শোভা দেখছিলাম,

কি পড়াচ্ছেন সে সম্বন্ধে একেবারেই অন্যমনস্ক। ফলে তাঁর কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারিনি এবং আমার ছোট ভাই প্রতিবারেই ঠিক উত্তরটি দিয়ে তার মুখে যে সুপ্রসন্ন হাসিটি ফুটিয়ে তুল্‌ছিল সেই হাসির শোভা আর সুরটুকু তৃষ্ণার্ত্তের মত পান করছিলাম। ছুটির পর আমার ছোট ভাইটিকে কাছে নিয়ে তিনি আবার আদর করলেন এবং আমাকে বল্লেন, "তোমার ভাইএর মতন মনোযোগী হোয়ো।"

মনে আছে সেদিন বাড়ীতে ফিরে এসে আমার আর খেলায় প্রবৃত্তি রইল না। আমাদের ছাদের কোণে একটী ছোট ঘর ছিল। সেইঘরে একলাটি বসে কেবল 'মেরী টিচারের' মুখখানি ভাবছিলাম, আর আমার ছোট বুকটির ভিতর যেন একটা তোলপাড় চল্‌ছিল। একটা রুদ্ধ কান্নার আবেগ কোন মতেই আর সাম্‌লাতে পারিনি, আর সেই কান্নার ভিতর দিয়ে তাঁর মুখখানি যেন বর্ষাস্নাত বনশ্রীর মত এক অপূর্ব্বকান্তি লাভ করেছিল। আবার তাঁকে দেখ্‌বার জন্য এবং তার প্রসন্নতা লাভ করবার জন্য আকুল হয়ে উঠ্‌লাম।

সেদিন রাত্রে নিতান্ত সুবোধ বালকের মত মাষ্টার মশায়ের কাছে বসে স্কুলের পড়া তৈরী করলাম। পরদিন ভোর বেলা আবার রাত্রের পড়া ঝালিয়ে নিয়ে স্কুলে গেলাম। সে দিন ক্লাসে প্রথম হয়েছিলাম, তাঁর স্মিতমুখের প্রসন্ন দৃষ্টি অর্জ্জন করেছিলাম এবং সর্ব্বোপরি ছুটির পর যখন আমাকে গালে হাত দিয়ে 'You are a clever boy' বলে অনেক আদর করলেন, তখন সে অমৃতের স্পর্শটী যেন আমার বুকের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে গেল।

দিনের পর দিন ক্লাশে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম, আর যেই তিনি আমার দিকে তাকাতেন অমনি মুখ ফিরিয়ে নিতাম, পাছে টের পান যে, আমার তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টি তাঁকে অগস্ত্য-গণ্ডুষে পান করবার চেষ্টায় আছে। সাত বছরের সেই পুরুষশাবকটির প্রাণে এ

বিদেশিনী তরুণী যে এক অনির্ব্বচনীয় মোহাবেশ এনে দিয়েছিলেন উত্তরকালে কোন রমণীই তার জীবনে সে অপূর্ব্ব অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করতে পারেনি। আজ যৌবনের শেষ সীমান্তে সেই সুদূর শৈশবের দিক্‌চক্রবালের একটী কোণে আমার সেই প্রথম উষার শুকতারাটির স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে। সেই শিশু-হৃদয়টীর ভিতর অনাগত যৌবনের পূর্ণোপলব্ধি যেন কি এক অতিনৈসর্গিক উপায়ে লাভ করেছিলাম।

আকাশের এপার ওপার ছেয়ে যে রামধনু ফুটে ওঠে তার বর্ণচ্ছত্রের প্রত্যেক রংটি যেমন ঘাসের ডগার উপর একটি শিশির-বিন্দুকে অনুরঞ্জিত করে, তেমনি শাস্ত্রোক্ত সাত্ত্বিক বিকারের সব কয়টীর লক্ষণ যেন আমার শৈশব-প্রণয়ে দেখা দিয়েছিল। তোমরা হাসবে এবং আমিও এখন হাসি,—কিন্তু আমার ভিতরকার সেই প্রেমোন্মাদগ্রস্ত শিশু-যুবকটি যে রকম করে আপনার হৃদয়াবেগের ঘূর্ণিপাকে দিনরাত হাবুডুবু খেত সেকথা ভাবলে বেচারীর জন্য হাসির ভিতরও চোখে জল আসে। এস্রাজে তরফের তারগুলি বিনাস্পর্শে আসল তারটীর প্রতি ঘাটের সুরে সুরে যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে, 'মেরী টিচারের' প্রতি কথায় প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি ভঙ্গীতে আমি তেমনি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতাম। তাঁর কথাবার্ত্তা, চালচলন, বীণকারের অঙ্গুলিস্পর্শের মত আমার বুকের ভিতর কত রাগরাগিণীর সৃষ্টি করত। তাঁর পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ, এমনকি সূক্ষ্মতম সৌরভটি পর্য্যন্ত যেন সেই স্কুলঘরের বদ্ধ বাতাস থেকে নিঃশেষে শোষণ করে নিতাম। আমার হাতের থেকে পেন্‌সিলটি নিয়ে যখন শ্লেটে লিখে দিতেন তখন তাঁর স্পর্শমাখা সেই পেন্‌সিলটি যেন ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডে পরিণত হত! শ্লেটে তাঁর হাতের লেখার উপর পেন্সিল বুলিয়ে যখন লিখতাম, তখন মনে হত রেখায় রেখায় যেন তাঁরি সঙ্গে মিশে যাচ্ছি।

টিফিনের ছুটীর সময় আমরা খেলা করতাম, 'মেরী টিচার' হেড্ মিস্ট্রেসের ঘরে বসতেন। লুকোচুরি খেলার সময় আমি বেছে বেছে ঠিক এমনি স্থানে লুকাতাম যেখান থেকে জানালার ফাঁক্ দিয়ে তাঁকে দেখতে পাই। মনে পড়ে, একদিন ছুটির পরে যেই আবার ক্লাশের ঘণ্টা পড়ল তিনি সেই সময়ে একটা কাঁচের গ্লাসে জল খাচ্ছিলেন। যেমনি তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন অমনি সেই ঘরে ঢুকে তাঁব পরিত্যক্ত সেই জলটুকু অমৃতের মত এক নিশ্বাসে পান করলাম। আর মনে পড়ে সেই জলপান করবার সময়,' গ্লাসের কাণাটা মুখে রেখে গেলাসটি ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম, যেখানে ঠিক তাঁর অধরেব স্পর্শটী লেগেছিল সেইখানটি যেন লেহন করে নিতে পারি। সেদিনকার সেই চুরি করে অমৃত পানের আনন্দটি আমার জীবনে অমর হয়ে আছে।

স্কুল থেকে বাড়ী এসে সব কি শূন্য মনে হত! কালিদাসের 'মেঘদূত' অবশ্য তখন পড়িনি। কিন্তু সব বিরহীর যে একদশা তার প্রমাণ যে, নীল আকাশে যখন মেঘ ভেসে যেতে দেখ্তাম তখন কতবার মনে হত যদি ওই মেঘে চড়ে তাঁর বাড়ীর ছাদের উপর যেতে পারতাম তাহলে বুঝি তাঁকে দেখ্তে পেতাম। তিনি যে আমার মতো সন্ধ্যার সময় তার বাড়ী ছাদের উপর থাকেন এটা ধরেই নিয়েছিলাম।

জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের পানে চাইলেই তাঁকে মনে হোত, তিনি যে অমনি জ্যোৎস্নারূপিনী। ছাদের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে অপলক চোখে চাঁদের দিকে চেয়ে থাক্তাম। আমার দুচোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়্ত, চন্দ্রমণ্ডলের মাঝখানে সে মোহিনী মূর্ত্তি ভাস্ত।

স্কুলে গুজব উঠ্ল, 'মেরী টিচারের' বিয়ে, তিনি আমাদের ছেড়ে শীঘ্রই চলে যাবেন। একের ঘরে যদি অঙ্ক থাকে তবে তাহার পেছনে শূন্যের পর শূন্য বসিয়ে লক্ষ কোটিতে উপনীত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু

সেই প্রথম অঙ্কটি মুছে নিলে যে সবই শূন্য হয়ে যায়। আমার জমার খাতায় একেবারে কোটি মুদ্রার প্রথম অঙ্কটি মুছে গেলে যে আমি শূন্যসারসর্ব্বস্ব হয়ে যাব। আমাদের প্রতিদিনের ইন্দ্রিয়চেতনার তনু মৃণালটি অবলম্বন করে প্রাণের ভিতর যে শতদলগুলি ফুটে উঠে, আমার জীবনের সেই প্রথম কমলটীর বোঁটায় টান পড়ল। বেদনায় সমস্ত প্রাণ টন্ টন্ করে উঠল।

সেদিন ভয়ানক ঝড ও বৃষ্টি। স্কুলের ছেলেমেয়েরা ঘণ্টাখানেক আগেই ছুটি পেয়ে বাড়ী চলে গেছে। আমাদের ঘরের গাড়ী তখনও আমাদের নিতে আসে নাই। সমস্ত আকাশ যেন আমারই প্রাণের আনন্দটাকে শতধা বিদীর্ণ করে পৃথিবী প্লাবিত করছে। 'মেরী টিচার' একলাটি হেড্ মিসট্রেসের ঘরে বসে কাকে চিঠি লিখছিলেন, মস্ত চিঠি, পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি। ছোট ভাইটী দিদির সঙ্গে গাড়ীর অপেক্ষায় বারাণ্ডার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আর রাস্তার জল দেখছে। 'মেরী টিচার' চিঠি লিখতে লিখতে থেমে একবার জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। খানিকক্ষণ চুপটি করে আকাশপানে চেয়ে থেকে যেই মুখ ফিরিয়ে আবার চিঠি লিখতে যাবেন এমন সময় কপাটের কাছে আমাকে দেখতে পেলেন। আমি তখন কেবল মাত্র দুটি চোখ বই আর কিছুই নই—সমস্ত দেহমন আমার বিস্ফারিত চক্ষুদুটিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

আকাশের বজ্র মাটিতে পড়বার আগে যেমন একটি মেঘের কোণে সঞ্চিত হয় আমি ঠিক তেমনি করে আমার চোখের ভিতর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছি। তিনি আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। তারপর একটু হেসে স্নেহমধুর স্বরে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অমন করে তাকিয়ে ছিলে কেন?" আমি বল্লাম, "আপনি চলে যাবেন? আর আমাদের পড়াবেন

না?" তিনি আমার গালটি ধরে আমাকে সস্নেহে চুম্বন করে বল্লেন, "আমি চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে?" এইবার সেই শ্রাবণ-আকাশের কান্না আকাশ ছেড়ে আমাকে আশ্রয় করল। সে ত কান্না নয়, একটা পূর্ণকুম্ভ যেন লোষ্ট্রাঘাতে শতধা হয়ে এক নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি তাঁর রুমাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাঁহার স্নেহোদ্ভাসিত মুখখানি আরক্তিম হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখা দিয়েছিল। সেই সান্ত্বনা, সেই সহানুভূতিপূর্ণ অশ্রুঢলঢল দৃষ্টি আজো দেখতে পাই।

'মেরী টিচার' যাবার আগে তাঁর একখানি ফটো আমাকে দিয়েছিলেন। আমি হিন্দু-সন্তান, পুরুষানুক্রমে পৌত্তলিক। আমি সে কাগজের প্রতিমাটিকে পূজা করে যথাসময়ে গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করেছি। কিন্তু যে চিরন্তনী নারীকে নানা বিগ্রহে আজীবন পূজা করে এসেছি, সে প্রতিমা উপাসনার প্রথম দীক্ষা যাঁর কাছে পেয়েছিলাম আজ তাঁর কথা তোমাদের এই প্রথম বললাম, এপর্য্যন্ত আর কারু কাছে বলিনি।

সোহিনী

সেদিন শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সহরে থাকি, এতটা সবুজ কখনও চোখে পড়ে না। আর সে কত রকমের সবুজ। কোথাও ফিকে, কোথাও গাঢ়, কোথাও জলের মত সমতল হয়ে হরিৎ ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে আছে, কোথাও বা বড় বড় গাছগুলির শাখা-প্রশাখার উপর ভর দিয়ে আকাশে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। সে সবুজ গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবার আলোছায়ার মীড়ে মীড়ে যেন মোলায়েম হয়ে উঠছে নামছে। কখনও স্থির, কখনও চঞ্চল, কোথাও নিরবচ্ছিন্ন, কোথাও বা বিচিত্র পাতার রেখায় রেখায় আকাশকে খণ্ডিত করেছে। একখানা বেঞ্চির উপর বসে দুটি চক্ষু ভরে সবুজের খেলা দেখছিলাম।

চোখের এই দেখার মধ্যে নানা আকার নানা বর্ণের খণ্ডতা, জটিলতা আছে। প্রত্যেক পাতাটি, নানাদিকে হেলান ছড়ান ডালপালাগুলি, আলোছায়ার চিত্র বিচিত্র বিন্যাস পরম্পরা, সব যেন বিশ্লিষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এই ছিন্ন টুক্‌রা গুলিকে একত্র সংহত করে তাদের মিলিয়ে মিশিয়ে মন একটা অখণ্ড অনুভূতি লাভ করে। কোথাও তার একটু ফাঁক্ নাই। সে যেন এই সব বিচিত্রতাকে শিলে পিশে, নিঙ্‌ড়ে তার রসটুকু মাত্র গ্রহণ করে, আর সব ফেলে দেয়।

এই সবুজের নির্য্যাসটুকু পান করে যখন বিভোর হয়ে আছি তখন বেঞ্চির গায়ে ছুরি দিয়ে খোদা আঁকা বাঁকা অনেক অজানা নাম

চোখে পড়ল। নেশার একটা ধর্ম্ম এই যে, সে মন থেকে দেশকালের বাঁধনগুলিকে আল্‌গা করে দেয়, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এখান ওখান সেখান সব মিশিয়ে একাকার করে তোলে। মনের এই রকম আলু-থালু অবস্থায় অনেক দিনের পুরাণ স্মৃতি আবার এসে দেখা দিল। আমার প্রাণের মধ্যে কত দেশে কতকালে কত লোক, এই বেঞ্চিতে বসার মত দুদণ্ড বসে চলে গেছে। কেউ কেউ আবার এম্‌নি করে নিজের নিজের নামটি আমার বুকের ভিতর খুদে রেখে গেছে। তাদেরি একজনের কথা বিশেষ ভাবে সেদিন মনের মধ্যে জেগে উঠল।

তার নাম সোহিনী। সে অনেকদিনের কথা। বিশবৎসরেরও অধিক হবে। আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। সে বৎসর পূজার ছুটিতে আমরা গিরিধিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়েছিলাম। আমাদের বাসার কাছেই এক প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরাও আমাদের মত সহুরে— পশ্চিমে হাওয়া খেতে এসেছেন। অল্প দিনেই দুই পরিবারে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। সে বাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। বড় মেয়ে সোহিনীর জন্যই বিশেষভাবে তাঁদের আসা। সে বেথুন স্কুলে পড়ত—দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীতে বোধ হয়। তার বয়স তখন আন্দাজ চোদ্দ কি পোনেরো হবে। 'প্লুরিসি' হয়ে বাঁচবার আশা ছিল না। কোনও রকমে সাম্‌লে উঠেছে। তখনও রোজ একটু একটু জ্বর হয়।

ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাবার ভার ক্রমে ক্রমে দেখি আমার উপরে এসে পড়ল। আমি ভোরে উঠে সকলকে তাড়া দিয়ে একত্রে জুটিয়ে মাঠে বাহির হতাম। এ রাখালি আমার লাগত বেশ। সবাই আমাকে গিরীশদা বলে ডাকত। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, পথের নুড়ি পাথর সংগ্রহে যোগ দেওয়া, আর মাঠের গরু মহিষের ভয় থেকে অভয় দান করা আমার নিত্য কর্ম্ম হয়ে উঠল।

ভোরের ফুরফুরে হাওয়া, চারিদিকের ঢেউ-খেলান বন্ধুর লালমাটির

উপর শ্যামল বনশ্রী, দূরে সুনীল আকাশের গায়ে পরেশনাথ পাহাড়ের তরঙ্গায়িত গাঢ়তর নীলিমা, বালির উপর দিয়ে উশ্রী নদীর ঝির্-ঝিরে স্বচ্ছ তরল ধারা, আর তার তীরে তীরে শাল-গাছ্‌গুলির স্তব্ধ জটলা। পাহাড়, মাঠ, নদী বনের এই উদার বিস্তৃতির মধ্যে, মেঘমুক্ত শরতের সুনীল আকাশের তলে আমরা গুটিকতক সহরের দড়ি-ছেঁড়া ছোটবড় ছেলেমেয়ে কি আনন্দেই ঘুরে বেড়াতাম। প্রকৃতির সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়। এতদিন যেন গুটি পোকার মত ছোট কোষটির মধ্যে বন্দী ছিলাম, এই প্রথম অবাধ মুক্তির ভিতর দুখানা রঙিন ডানা মেলে বাহির হলাম।

প্রাণের ধর্ম্ম এই যে সে স্পর্শ পেলেই সাড়া দেয়। আলোর স্পর্শে গাছের বুকে ফুলের ভাষা জাগে—কত বর্ণে, কত গন্ধে সে কথা কয়ে ওঠে। আমার প্রাণটিও তেমনি প্রকৃতির স্পর্শ পেয়ে আনন্দ মুখর হয়ে উঠেছিল। শরীরে স্বাস্থ্য আর মনে স্ফূর্ত্তির জোয়ার উথলে উঠেছিল।

চারিদিক থেকে যখন আপনাকে এমনি করে ভরে তুলছিলাম তখন আমার ব্যক্তিত্বটাও নানা রকমে আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এঞ্জিনে কয়লা দিলে তার উত্তাপটুকু যেমন কলের চাকাগুলির ঘূর্ণী পাকে আপনাকে মুক্ত করে দেয়, হাজার মণ বোঝাকে দেশ দেশান্তরে টেনে নিয়ে চলে ঠিক্ তেমনি করে একটা শক্তির আবেগ আমার মধ্যে জেগেছিল, তার প্রক্রিয়ায় আমার মনের সুপ্ত কলকব্জা-গুলি হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠল। এই নবোদ্বোধিত চাঞ্চল্য আমার সেই ছোট দলটিকে নব নব প্রেরণায় খুব সজীব করে তুলেছিল। সকালে বিকালে বেড়ান ছাড়া নানা রকমের খেলায় আমোদে গল্পে গানে আমাদের ছুটির দিনগুলি একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন আকাশে যে উল্কাগুলি এদিক ওদিক

ঠিকরে ঠিকরে পড়ে, তাদের সেই আলোর রেখাগুলিকে যদি পেছনের অগাধ অন্ধকারের ভিতর বরাবর টেনে দেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে, তারা সুদূর পশ্চাতে একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে মিশেছে, যেন সেই বিন্দুটির থেকে তারা দিকে দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমার এই আকস্মিক স্ফূর্ত্তির বিচিত্র ধারাগুলি ঠিক্ তেমনি করে কোন্ এক গোপন অন্ধকারের তলে একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দুর থেকে উৎসারিত হ'ত। সে বিন্দুটির যদি কোন মূর্ত্তি কল্পনা তখন করতাম তা'হলে দেখতে পেতাম তা সোহিনীরই ছায়ামূর্ত্তি। কিন্তু তখন মানসিক জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী হই নি। আমি যেমন দু'বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের 'দাদা' হয়েছিলাম সোহিনীও তেমনি উভয় পক্ষের এজ্‌মালি 'দিদি' হয়েছিল। এমনকি আমি পর্য্যন্ত ছোটদের দেখাদেখি 'সোহিনী-দি' বলে তাকে ডাক্‌তাম। প্রথমে তামাসা করে ডাক্‌তে আরম্ভ করি। সে ছোট হলেও আমি বয়সে তার চেয়ে এত বেশী ছিলাম না যে নাম ধরে ডাকাটা সহজে আসে। কাজেই ছেলেদের জবানীতে ডাকতে সুরু করেছিলাম, ক্রমে দেখি সেই ডাকটি বড় সহজ তৃপ্তির সঙ্গে মন থেকে বাহির হত।

সোহিনী বড় কম কথা বলত। অথচ গম্ভীর বলতে যা বুঝায় মোটেই তা ছিল না। বোধ করি তার চোখ দুটিতে এমন একটি স্বচ্ছতা ছিল যাতে তার মুখের কথার বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই তার চোখদুটি সে কথা বলে দিত। দুর্ব্বল শরীর হ'লে কি হয়, বেড়াতে যাবার উৎসাহ তার ছিল সব চেয়ে বেশী। পাৎলা ছিপ্‌ছিপে শরীরটি, প্রতিদিন সকলের আগেই সে প্রস্তুত হয়ে থাকৃত, তাকে একদিনও তাড়া দিতে হয় নাই। সকলের আগে আগে সে চলত। যখনই কিছু নূতন খেলার ফন্দি আঁটতাম অমনি দেখতাম চট্‌পট্ করে কোথা থেকে সে তোড়-জোড় সংগ্রহ করে দিত।

সে নিজে বড় একটা ঠাট্টা তামাসা করত না। কিন্তু অন্যের হাস্য কৌতুকে এমন একটি সহজ মধুর ভাবে যোগ দিত যাতে তার চোখের কোণে তরল হাসিটুকু ফোটাবার চেষ্টায় আমি অজ্ঞাতসারে রসিক হয়ে উঠেছিলাম। ছোট বড় সকলেই তাকে খুসী করবার জন্য যেন সর্ব্বদাই অবসর খুঁজত। তাকে খুসী করে সকলেই যে একটা আনন্দ অনুভব করত তার গূঢ় কারণটি বোধ হয় সকলের সম্বন্ধেই তার একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি। সকলেই দেখ্‌তাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার ইচ্ছা পূর্ণ করত অথচ কখনও মনে পড়ে না—সে কোন বিষয়ে মুখফুটে কোনও একটা অনুরোধ কাকেও করেছে। সন্ধ্যার পর তাদের বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমি যে গানের বৈঠকটি জাঁকিয়ে তুলেছিলাম তার মূলে ছিল 'সোহিনীদি'। তার গান গাওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু সে হার্ম্মোনিয়ামটি হাতে নিয়ে একে একে আমাদের সকলের গলা খুলে দিল। প্রথমে আমার ছোট বোনটিকে দিয়ে সঙ্গীত সভার সূত্রপাত হ'ল। কান টানতে মাথা আসে—সাগ্‌রেৎ-এর টানে ওস্তাদ্‌জি ধরা পড়ল। আমার গলা নিতান্ত মন্দ ছিল না। সকলে যখন আমাকে পীড়াপীড়ি করে অস্থির করে তুল্‌ত, সোহিনী তখন কেবল তার বড় বড় চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকাত। সে চোখের উপর আমার চোখ পড়লেই আর দ্বিতীয়বার অনুরোধের অপেক্ষা থাকত না। সবাই যখন বাহবা দিত সে কেবল আমার মুখের উপর দিয়ে তার স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টিটি বুলিয়ে দিত—আমার গান গাওয়া সার্থক হয়ে যেত।

কত সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সময় সে অবাক্ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত, বেড়াতে বেড়াতে কত সময় চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে চারি-দিকের শোভা সৌন্দর্য্য ওই দুটি অপলক চোখ দিয়ে নিঃশেষে পান করে নিত। নদীর যে বাঁকটি সুন্দর, বনের যেখানটি মনোরম, 'ভাদুয়া' পাহাড়ের যে দিক্ থেকে উপত্যকার শোভাটি অতুলনীয়, ক্ষেতের

যেখানটিতে সবুজ রংটি সব চেয়ে সুকোমল, ঠিক্ সেই সেই জায়গার মাধুর্য্য তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, বইএর সুন্দর লাইনগুলির পাশে সুরসিক পাঠকের পেন্সিলের দাগের মত, যেন বিশেষ করে চিহ্ন-রেখা অঙ্কিত করে দিত। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে কত কথা বলতাম—সে নীরব সহানুভূতির সঙ্গে কেবল শুনত, তার মুখে একটি কথাও ফুটত না, যা বলবার তা ওই আনন্দ-বিস্ফারিত দুটি আকুল চোখ দিয়েই শুধু জানাতো।

কলিকাতায় ফিরবার আগের দিন আমরা মহেশমোণ্ডার পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। চারখানা পুষ্পুষে আমরা দুই পরিবার ছোট-বড় সকলে মিলে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের নীচে এক ঝরণার ধারে আমাদের 'চড়ুই ভাতি' হ'ল। বড়রা সতরঞ্চি পেতে তাস খেলতে বসে গেলেন, আর আমি আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে পাহাড়ে চড়তে গেলাম। আসলে সোহিনীই পথ প্রদর্শক। সে একলাই পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে দেখে আমি ছুটে এগিয়ে গেলাম, পিছন পিছন আর সকলে এসে জুটল। গিয়ে দেখি দুটো সাঁওতালের ছেলেকে পয়সা দেবার লোভ দেখিয়ে সোহিনী তাদের 'গাইডের' পদে বাহাল করেছে। আমি সঙ্গ নিলাম। একটা জায়গা খুব চড়াই। লঘু পদে উঠতে গিয়ে সোহিনীর পা পিছ্লে গেল, পড়বার আগেই আমি ধরে ফেললাম। আর বেশী উপরে উঠতে বারণ করাতে সে কেবল তার সেই চোখ দুটি তুলে ব্যাকুলভাবে আমার দিকে চাইল। সে চাহনির মানে 'আমাকে উঠতে দাও—একলা না পারি তুমি সাহায্য কর।' আমি হাত বাড়িয়ে বললাম 'আমার হাতটা ভাল করে ধর।' বজ্রমুষ্টিতে তার কোমল হাতখানি ধরে তাকে চড়াইটা পার করে দিয়ে ছেড়ে দিলাম। সে আবার আমার মুখের দিকে চাইল। সেটা ধন্যবাদের দৃষ্টি। কিন্তু সে দৃষ্টিতে কি আর কিছু ছিল?

ফুলের একটি বিশেষ মুহূর্ত্ত আছে—একটি মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন সে

ফোটে। সূর্য্যের আলো ফুলটি ফুটবার আগে ও পরে থাকে। কিন্তু এমন একটি কিরণ আছে ঠিক্ যেটির স্পর্শে ফুলের ঘুম ভাঙে। সেই যে একলা তাকে ফুটিয়েছে তাহা নয়, তবু প্রথম চোখ মেলেই ফুলের সঙ্গে যে আলোটুকুর দৃষ্টি বিনিময় হয় ফুল হেসে তাকেই বরণ করে। কুসুম কলিটির মত যে বালিকাকে এতদিন কেবল স্নেহের চক্ষে দেখতাম তার সেই বিকচ সুষমায় এমন একটি মুখ দেখা দিল যাহা আগে কখনও দেখি নাই। কেমন একটা সঙ্কোচ এসে আমাকে আচ্ছন্ন করল। আর একটু উপরে উঠেই হঠাৎ সোহিনী নামবার জন্য ফিরল। তার মুখে কেমন একটা ব্রীড়া-কুণ্ঠিত ভাব লক্ষ্য করলাম যা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি। নামবার সময় তাকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়ালাম। আমার হাত না ধরেই সে ঢালু জায়গাটা ত্রস্ত হরিণীর মত এক উল্লম্ফনে পার হয়ে গেল। অন্যদিন হলে বাহাবা দিতাম, কিন্তু তখন যেন কেমন একটা লজ্জা ও দ্বিধা এসে আমার কণ্ঠ রোধ করল।

পরদিন সকালের গাড়ীতেই রওনা হলাম। ও-বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই ষ্টেশনে এল, কিন্তু সোহিনী এল না। আশা করে-ছিলাম যাবার আগে তাকে একবার দেখতে পাব। কিন্তু শুনলাম তার শরীর ভাল নাই তাই সে বাহির হয় নি।

বাড়ীর আর সকলেই তখন গিরিধিতে ছিলেন। আবার বড় দিনের ছুটিতে সেখানে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে ফিরব এই কথা ছিল। কিছুদিন পরে খবর পেলাম সোহিনীর শরীর মোটেই ভাল নাই। ডাক্তারেরা সন্দেহ করছেন তাকে যক্ষ্মায় ধরেছে। বড়দিনের ছুটির জন্য পথ চেয়ে ছিলাম কিন্তু আমার যাওয়া হল না কারণ বাড়ীর সকলে আগেই চলে এলেন।

এর পর ছয়মাস কেটে গেছে। কলেজে লেক্চারের সময় অন্য-

মনস্ক ভাবে জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখছি। মুক্ত আকাশ। কোথাও বাধা নাই, প্রাচীর নাই। ওই আকাশে একটিবার পাখীর মত দুটি ডানা মেলে যদি ভেসে যেতে পারতাম। কোথায় যেতাম? মোটে ২০০ মাইল, উড়তে কতক্ষণ লাগে? কাছে দেখতে পাই, দূরে দৃষ্টি পৌছয় না কেন? পাই বই কি! এই যে সোহিনী সেই ঘরটিতে বসে আছে। না, এ ত আমার গিরিধির ঘর নয়। এ যে আমার ঘর, আমার অনাগত ভবিষ্যতের ঘর। গৃহলক্ষ্মী আমার, তুমি আমার ঘরে কবে এলে? আকাশের স্থনীল পর্দ্দায় ভূতভবিষ্যতের সিনেমা দেখছি এমন সময় বেহারা এসে প্রফেসারের হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিল। তিনি সেখানা পড়ে হাঁকলেন Girish Chandra Bhattacharya is wanted outside।" বাইরে এসে দেখি সোহিনীর পিতা! আমাকে দেখেই আমার হাত ধরে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "একবার আমাদের বাড়ী চল বাবা, ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন, আজ রাত্রি টেকে কিনা সন্দেহ। সে একবার তোমাকে দেখ্‌তে চায়।"

জানালার ফাঁক্ দিয়ে আকাশে যে দৃশ্য পটটি দেখেছিলাম তাহার উপর যে এমন করে যবনিকা পতন হবে কে জানত!

রোগীর ঘরে কেবল রোগীর মা ছিলেন। সোহিনীর বাবা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে সজোরে বললেন "দেখ মা, কে এসেছে।" সোহিনী চোখ মেলল। মুখ নীচু করে বললাম "আমাকে চিন্‌তে পার, সোহিনী?" তার চোখ দুটি যেন বলে উঠল "হাঁ চিনতে পারি বই কি, তোমার কি আমায় মনে আছে?" হঠাৎ তার কাশি উঠল। তারপর প্রায় পাঁচ মিনিট নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। আবার চোখ মেলে আমার দিকে চাইল—অনিমেষ দৃষ্টি। খানিকক্ষণ পরে কম্পিত হাতখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি হাতখানি ধরলাম। কি যেন বলতে চেষ্টা করছে বুঝে তার মুখের কাছে কান নিয়ে

গেলাম। শুনলাম "পাহাড়ে চড়ার কথা মনে আছে? তখন হাত বাড়িয়ে দিলে ধরি নি, আজ ধরছি—নামতে ভয় হচ্ছে।"

আবার কাশি উঠল। আমি তার হাতখানি ধরে শিয়রে বসে রইলাম। এবার যখন আমার মুখের দিকে চাইল তখন সেই দৃষ্টি—সেই নব-যৌবনের ব্রীড়া-বিহ্বল মুগ্ধদৃষ্টি। আমার হাতের ভিতর তার হাতখানি কেঁপে উঠল। তারপর দেখি হাতখানি সরিয়ে নিয়ে তার বামহাতের আঙুল থেকে আংটি খুলবার চেষ্টা করছে কিন্তু খুলতে পারছে না! বিজড়িত স্বরে ব্যাকুল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—"তুমি খুলে নিয়ে পর।" সোহিনীর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি আংটি পরলাম সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আভা তার চোখদুটিতে ফুটে উঠল। তারপর দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হাত ধরে চোখ বুঁজল। সে চোখ আর খুলল না।

সোহিনীকে ভাল বেসেছিলাম কিনা জানি না। যদি ভালবাসা মানে পতঙ্গের আত্মহারা বহ্নি-বুভুক্ষা হয়, তবে বাসি নাই। পূর্ব্বরাগের যে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশ যাহা ঠিক্ অরুণোদয়ের মতই জল স্থল আকাশ এক অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত করে সে সম্মোহ, পুলকোচ্ছ্বাস সে আমার জীবনে আনে নাই। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে এক অপূর্ব্ব তরল আলোক মেঘমুক্ত আকাশকে একটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল মেদুরতায় ভরে দেয়, সে আমার জীবনে শুকতারার নিবাত নিষ্কম্প দীপটি হাতে নিয়ে সেই স্বচ্ছ প্রদোষে ঊষারাণীর মত নিঃশব্দ চরণে এসেছিল। সে আলোয় দীপ্তি ছিল, দাহ ছিল না। অনাবিল স্নেহ সৌহার্দ্দের আস্বাদন সেই আমার প্রথম ভালবাসায় পেয়েছিলাম। ভ্রূণ শিশুর অপরিণতির এমন একটি অবস্থা থাকে যখন সে স্ত্রী অথবা পুরুষের বিশিষ্টতা লাভ করে নাই। সোহিনীর প্রতি আমার বাল্যপ্রীতি তেমনি অপরিণত ছিল। ভ্রাতৃস্নেহ

কিম্বা দাম্পত্যপ্রেম, কোন আকারে আমার জীবনে তাহার পূর্ণবিকাশ হবে তাহা তখন বুঝতে পারি নি। সেই মহেশমোগুার পাহাড়ে আমার করস্পর্শে যখন তার প্রাণে প্রথম নবযৌবনের শিহরণ জেগেছিল সেই সময়ে আমার জীবনের পূর্ব্বাকাশে হঠাৎ একটা সোনালি আভা দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর মেঘে সব আকাশ ছেয়ে গেল—সূর্য্যাস্তের আগে আর সে মেঘ অপসৃত হ'ল না।

জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তারপর এই কুড়িটা বৎসর কাটালাম; অনেক বিরহমিলনের ভিতর দিয়ে আমার জীবন উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এ সকলের ভিতরও তার হাতখানি আমার হাতে আছে। অনেক সময় তাকে তেমনি ভুলেছি যেমন নিতান্ত আপনার লোককেও মানুষ সুখের দিনে ভুলে থাকে কিছু দুঃখের দিনে স্মরণ করে। স্মরণ করে যখন সহানুভূতির জন্য হাহাকার প্রাণে জাগে। বহুকাল পরে সেদিন কোম্পানীর বাগানে সহরের এই ছানি-পড়া চোখে যখন সবুজের আমেজ জেগেছিল তখন ওই বনস্থলীর মতই অবচনা, অমনি স্নিগ্ধ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ সোহিনীর সেই মমতা-মাখা চোখদুটি অনিমেষ করুণ দৃষ্টিতে আমাকে অভিষিক্ত করেছিল।

বাসন্তী

ইংরেজিতে যাহাকে বলে Sweet Sister, আমার সেই মধুর কুটুম্বিনী ওরফে ছোট শালী বাসন্তী তার autograph বা হস্তলিপি-পুস্তিকাখানি এনে বলল, "মোহিনী দা', আমার এই খাতায় তোমাকে একটা কবিতা লিখে দিতেই হবে, লক্ষ্মীটি!" আমি বল্লাম, "না লিখ্‌তেই লক্ষ্মী হয়ে গেলাম! তুই এরকম ঘুস দিতে শিখ্‌লি কবে থেকে?" আমার বিবাহের সময় বাসন্তী যখন 'নিত্‌কনে' সেজে তার দিদির পাশে বসেছিল তখন তার বয়স আট বৎসর। সে আজ নয় বৎসরের কথা। সুতরাং এখন সে ষোড়শীর উপরও এককাঠি। আই-এ, দেবে এবার। ছুটিতে আমাদের বাড়ীতে এসেছে। মৎলবটা আমার কাছে পরীক্ষার ইতিহাসটা একটু ঝালিয়ে নেবে, যেহেতু আমি ইতিহাসের প্রফেসর্।

আমি তার খাতাখানা খুলেই যে সাদা পাতাটা সাম্‌নে পেলাম তাতে লিখে দিলাম:—

'বাসন্তী ভাই,
বুদ্ধিতে আমার মত আর
স্বাস্থ্যে পশুর মতন হও।
—মোহিনী-দা।'

বাসন্তী খুব আগ্রহ সহকারে খাতাখানি নিয়ে আমার আশীর্ব্বচন পড়বামাত্র খাতাটা আমার গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "তুমি ভারী দুষ্ট মোহিন্‌-দা'। এই বুঝি তোমার কবিতা হল?" আমি বললাম,

"এই ছিলাম 'লক্ষ্মীটি' আর মিষ্টি ডাকের মধুর রেশটি কাণে না থামতেই হয়ে গেলাম 'দুষ্টু'। 'অব্যবস্থিতচিত্তায়া প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।'

"দুষ্টু নও? লিখতে বললাম কবিতা, আর লিখলে কিনা নিজের সার্টিফিকেট্!"

আমি বললাম, দেখ্, ধন, যশ, মোক্ষ, শত্রুর নিধন ইত্যাদি অনেক জিনিষেরই প্রার্থনা লোকে ভগবানের কাছে করে। কিন্তু বুদ্ধির অভাব জানিয়ে এ পর্য্যন্ত কোনো দরখাস্ত তাঁর কাছে পৌঁছয়নি। আমাদের কবি 'আরো আলো,' 'আরো বেদনা', 'আরো প্রাণ' ইত্যাদি তাঁর গানে চেয়েছেন, কিন্তু 'আরো বুদ্ধি' ত চান্‌নি! এই উত্তম পুরুষের যে শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধি তুই যদি পাস্ তা হ'লে সব পরীক্ষাতেই পাশ হ'বি, আর আমার চেয়েও সৎপাত্র খুঁজে পাবি। তোর দিদি ত আমার বুদ্ধি দিয়ে আমাকে আবিষ্কার করেনি। আর ভেবে দেখ্ দেখি, পশুর মত স্বাস্থ্য-সম্পদ্ কার? মানুষ যেদিন থেকে সভ্য হয়েছে, সেদিন থেকে তার স্বাস্থ্য ভাঙ্‌তে আরম্ভ করেছে। ইউরোপ যেদিন আমাদের মত সুসভ্য হবে সেদিন দেখিস্ ওদের পেটে সাগু বার্লি পর্য্যন্ত সহ্য হবে না। ওরা এখনও পশুর স্বাস্থ্য উপভোগ করছে, এখন দেশ মহাদেশ ওরা দিব্যি চিবিয়ে খাচ্ছে, কারণ ওদের স্বাস্থ্য এখনও অক্ষুণ্ণ। ইতিহাস ত এই কথাই বলে।"

"তুমি ক্লাশের ছেলেদের বুঝি এই রকম হিষ্ট্রী পড়াও? আমি তোমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল্ হ'লে তোমাকে নোটিশ দিতাম।"

"আমাকে বরখাস্ত কর্‌লি ত, আচ্ছা দেখি তোকে কে হিষ্ট্রী পড়ায়!"

"না, মোহিন্‌দা' সত্যি, একটা কবিতা লিখে দাও। পশুর বুদ্ধি আর তোমার স্বাস্থ্য দুই-ই **refused with thanks**, থুড়ি, তোমার বুদ্ধি আর পশুর স্বাস্থ্য—তা' দুই-ই এক কথা, না মোহিন্-দা'?"

আমি বাসন্তীর কথায় আর কর্ণপাত না করে তার **autograph** এর

খাতার পাতা উল্‌টাতে লাগলাম। হঠাৎ একটি অচেনা নাম চোখে পড়ল। Browning-এর Evelyn Hope কবিতাটির লাইন ক'টি উদ্ধৃত করা এবং নীচে নাম সই—দেবেন্দ্রনাথ রায়।

"So, hush,—I will give you this leaf to keep—
See, I shut is inside the sweet cold hand.
There, that is our secret! go to sleep;
You will wake and remember and understand."

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ দেবেন্দ্র নাথটি কে?"

বাসন্তী বল্‌ল, "তা' তোমাকে বল্‌ব কেন? 'That is our secret,' তোমার সঙ্গে আড়ি। তুমি আমার কথা রাখলে না, আমি তোমার কথা শুনব কেন?"

"আচ্ছা, যদি কবিতা লিখে দিই, তা হ'লে বলবি?"

"আগে unconditional surrender কর ত। তারপর আমার খুসী হয় বলব, না হয় না বলব, আগে ভাগে কথা দিচ্ছি না।"

"আচ্ছা, দে খাতাখানা।" বাসন্তী খাতাখানা দিল, আমি কলম নিয়ে বসলাম।

"খবদ্দার, এখন এদিকে চাইতে পারবি না। ওই কোণে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাক্, যতক্ষণ না ডাকি।"

"জো হুকুম" বলেই সে ছুটে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াল এবং গুন্‌তে লাগল 'এক—দুই—তিন।' আমি লিখলাম :—

'এক দুই তিন,
সুরে সুরে বাজ্‌ছে কালের বীণ্।
চার পাঁচ ছয়,
রঙে রঙে পলের পরিচয়।
নিত্য নূতন নূতন সুরে সুরে

নূতন রং-এর তুলি ঘুরে'
উজ্জ্বলে আর ম্লান মধুরে
আঁক্‌ছে আমার ছবি।
দুঃখ সুখের গুন্‌গুনানি
রং-এর রসের তাঁত-বুনানি,
নানান্ সুরের কাণাকানি
শুন্‌ছে আদি কবি।'

"হল ?"

"হয়েছে, আয়।"

বাসন্তী কবিতাটা পড়ে বলল, "একি ছাই কবিতা হ'ল! শিগগি্‌র আর একটা ভাল কবিতা লেখ, তা না হ'লে এই মুখে চাবি দিলাম।"

"আচ্ছা, দে খাতাটা, একটা পাতও বাকী রাখব না।" ফের লিখলাম :—

'গ্রামোফোনের চাকৃতিখানার নানা রেখার ফাঁকে
সুরের পাখী গুটিয়ে পাখা লুকিয়ে যেমন থাকে,
তেম্‌নি তোর এ খাতার পাতার হিজিবিজির রেখায়
আমার গানের মৌন তানের স্বরলিপি ঘুমায়।
যদি সে ঘুম ভাঙতে পারিস্ খুলে যাবে কাণ,
শুন্‌বি তখন জড়ের ফাঁকে পরমাণুর গান।'

পড়ে শুনালাম। বাসন্তী বল্‌লে, "এও কিচ্ছু হ'ল না।" তারপর কাছে এসে খাতাখানা নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে একটা ছবি বার করে বললে, "এই ছবিটার নীচে একটা কিছু লিখে দাও না ?"

আমি বল্লাম, "বাঃ দিব্যি ছবি ত! কে এঁকেছে, তুই ?"

"আবার কে ?"

"ছবি আঁকতে শিখ্‌লি কবে ?"

"তুমি কবিতা লিখতে শিখলে কবে ?"

"কপি করেছিস্, না মন থেকে এঁকেছিস্ ?"

"সেবার পুরীতে যখন গিয়েছিলাম, তখন আমাদের বাংলার কাছে বসে একদিন সমুদ্রের উপর সূর্য্যাস্তের যে আভা পড়েছিল সেইটা মনে করে আজ সকালে এঁকেছি ?"

সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের ছবি। সন্ধ্যার অন্ধকার আর আকাশের স্বর্ণসিন্দুর সমুদ্রের সুনীলে গলে গিয়েছে। ছোট একখানি নৌকা ভরা পালে সে অকূলে পাড়ি দিচ্ছে।

"না, না, এ পাতটা আমি হিজিবিজি করে নষ্ট করব না।"

"তোমাকে নষ্ট করতেই হবে নইলে আমি তোমাকে কিছু বলব না। অনেক কথা বলবার আছে কিন্তু।"

"আচ্ছা, আমার হার, তোর্ জিৎ আজকে। দে লক্ষীছাড়ী, খাতাখানা দে।"

ছবির নীচে লিখে দিলাম :—

'হে অকূল, হে অতল, অশেষ আমার,
এ চির চঞ্চল তরী
অন্তহীন পথ ধরি'
চলে অভিসারে তব, বুকেতে তোমার।'

বাসন্তী কবিতাটা আস্তে আস্তে দু'বার পড়্‌ল। তার আবৃত্তিটা আমার লেখার শূন্যতার উপর একটা সুরের জাল বুনে দিল, আকাশ যেমন করে রং-এর তুলি সমুদ্রের নীলে বুলিয়ে দেয়। আমি বল্লাম, "বারবার তিনবার লিখলাম। এবার ছেড়ে দে, কেঁদে বাঁচি। তারপর, দেবেন রায় কে রে ?"

বাসন্তী বল্‌ল, "তুমি চিনবে না। আমাদের ক্লাশে প্রমীলা পড়ে, তার দাদা।"

"তোর খাতায় এসে জুটল কোত্থেকে ?"

"সে অনেক কথা। তোমাকে আর দিদিকে একসঙ্গে বলব, চল যাই।"

গৃহস্থের বাড়ীর আশপাশের জমির উপর তার যেমন একটা মমতা থাকে এবং সে জমি আর কারো দখলে গেলে যেন তার নিজের জমিই ভাঙনের জলে ডুবল, এই রকম একটা হুতাশ তার মনে জাগে, আমি কতকটা সেই রকমের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললাম, "এইবার দেখছি আমার সঙ্গে **boundary dispute**-এর মাম্‌লা বাধবে।"

"দুই ভাই পাশাপাশি জমি নিলে মাঝের দেয়ালটা রাখবার দরকার না-ও হ'তে পারে। তোমাদের সঙ্গে দেবেন বাবুর আলাপ করিয়ে দেব। তিনি এখানে আসবেন কথা দিয়েছেন।"

কিছুদিন পূর্ব্বে আমার গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হওয়ামাত্র আমি শ্বশুরালয়ে গিয়েছিলাম এবং ভার্য্যা ও ভার্য্যানুজা সমভিব্যহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি। আসবার সময় শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের সঙ্গে শ্বশুর মশায়ের মনোনীত একটি পাত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা হয়েছিল। পাত্রটি কুলমর্য্যাদায় ও ধনৈশ্বর্য্যে বরণীয়। কর্ত্তার যখন ইচ্ছা, কর্ত্রী ঠাক্‌রুণের অভিমত সে ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনি মাত্র। বরপক্ষীয়েরা এবং স্বয়ং বর বাসন্তীকে দেখে গিয়েছে। কিন্তু মেয়ে তার মাকে জানিয়েছে যে, পাত্রটি তার বাপ মার মনোনীত হলেও তার এ বিবাহে মত নেই। পরীক্ষার আগে সে কোনোমতেই বিবাহ করবে না। শেষোক্ত কথায় বরপক্ষীয়েরা পশ্চাৎপদ হননি, বরং বধূমাতা মা সরস্বতীর কমল-বনের আর একটি পদ্ম তুলে আনতে পারলে আমার শ্বশুর মশায়কে সেই ওজনের যৌতুকের সোণা (রেয়াৎ) দেওয়া যাবে, এই রকম ভরসা দিয়েছেন। শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ জান্‌তেন, বাসন্তী আমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভালবাসে এবং আমার কথা অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

সুতরাং বিশেষ করে উক্ত পাত্রটির সম্বন্ধে কন্যার কাছে ওকালতী করবার জন্য আমাকে নথিপত্র বুঝিয়ে দিলেন। বাসন্তী যে History পড়বার অছিলা করে আমার কাছে আশ্রিত-বাৎসল্য ভিক্ষা করবে এবং তার দিদি ও ভগ্নিপতিকে তার পক্ষের ওকালতনামা দিবে, একথা বুঝতে আর বিশেষ বিলম্ব হল না।

আমার ঘটকালির বিবাহ, এবং গৃহিণীর কল্যাণে ঘটক ঠাকুরকে অভিসম্পাত করবার প্রবৃত্তি কোনো দিন হয়নি। কিন্তু এই কঠিন মৃত্তিকার উপরে যে সুনীল আকাশটি আছে তাতে পাশ্চাত্য-সাহিত্য-পুষ্ট চক্ষে যে কল্পলোক মাঝে মাঝে পুঞ্জমেঘে দেখা দেয়, সে লোকে উড়ে যাবার সাহস ও শক্তি না থাকলেও যারা উড়তে চায় তাদের প্রতি যে কতকটা সহানুভূতি নেই তা বলতে পারিনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকে এমন অনেক কথা আছে যা আমাদের ভাবী হিন্দু কুলবধূদের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পক্ষে ঠিক্ সনাতন বিধির অনুকূল নয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ততঃ একটা স্বভাবসিদ্ধ ফল এই যে, আমরা নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট জীব বলে দেখতে শিখছি। তার জীবন যে তার নিজস্ব সম্পত্তি, তার ভাব ও চিন্তার মূল যে তার হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে নিহিত, এ কথা আমাদের মুখে ও তাদের কাণে উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাইবেল বলেন, আদিতে কেবল 'বাক্য' ছিল, সেই বাক্য হতেই এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য জানিনে, জানবার বাসনাও নেই, কিন্তু মানুষের প্রাণে বাণী থেকেই যে মহাপ্রাণী উদ্বুদ্ধ হয়, তা অস্বীকার করতে পারিনে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, পূর্ণ মাত্রায়ই হোক্ আর আংশিক ভাবেই হোক্, গ্রহণ করে তার অবশ্যম্ভাবী ফলকে এড়িয়ে যাব, এমন নৈয়ায়িক বুদ্ধি আমার নেই। সুতরাং উক্ত দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার শ্যালিকার পূর্ব্বরাগের কাহিনী যেমন সহজ সরল ভাবে আমার কাছে প্রকটিত হল তাতে আমি কতকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম।

পূর্ব্বেই শাশুড়ীর পক্ষে উকিল হয়েছি, সুতরাং তাঁর সপক্ষে লড়বার আইন কানুন যথাসাধ্য ব্যবহার করলাম, কিন্তু দেখলাম 'কেস্' টিকবে না। বরং তর্ক কর্‌তে গিয়ে শেষটায় বল্‌তেই হল,—

'জয়ন্তু মনুপুত্রীনাং যাসাং পক্ষে রতিপ্রিয়ঃ।'

বাসন্তীর প্রকৃতিতে নারী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা বস্তুটির নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল। কিন্তু তার চেয়ে একটা বড় জিনিষ ছিল, যাকে দ্বিধাকুণ্ঠাহীন সাহসিকতা বলা যেতে পারে। যে লোক বাঘের চোখে চাইতে পারে তাকে নাকি বাঘে ধরে না—বাঘের প্রাণের ত ভয় আছে। সেই স্বচ্ছ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাসন্তীর চোখে ছিল। এ দৃষ্টি আমাদের হিন্দু ঘরের মেয়ের চোখে ফুটল কেমন করে বলা কঠিন,—অবরোধের লৌহগরাদের ভিতর এ দৃষ্টি ত ফোটে না। আমার শ্বশুর মশায় রক্ষণশীল হিন্দু হলেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটু উদারপন্থী ছিলেন এবং যৌবনে বিবাহের সময়ে খুঁজে বেছে মিশনারী স্কুলে পড়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। শাশুড়ী ঠাকৃরুণ বিবাহের অব্যবহিত পরেই গৃহকর্ত্রী হলেন, কারণ বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁর বিধবা শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। বাড়ীতে বর্ষীয়সী মহিলা আর কেউ ছিলেন না। সুতরাং বাড়ীর আবহাওয়া নিতান্ত কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল না। আমার ভায়রা পশ্চিমে ওকালতী করেন। তিনি জ্যেষ্ঠাকে এবং আমি মধ্যমাকে গ্রহণ করেছি। পুত্রসন্তান না থাকাতে আমিই পুত্রের স্থান কতকটা অধিকার করে এই বাড়ির অন্তঃপুরে জানালা ফুটিয়ে কতকটা সূর্য্যালোক ও মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বাসন্তী যখন খ্যাতির সহিত ম্যাট্রিক পাশ করল তখন অনেকটা আমার প্ররোচনায় সে তার বাবার নিকট আই-এ পড়বার অনুমতি ও আনুকূল্য পেয়েছিল।

তবে সম্প্রতি শ্বশুর মহাশয়ের "ডায়েবিটিস্" ধরা পরবার পর থেকেই কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়ছিলেন এবং যে

পাত্রটি স্থির করলেন তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। বাসন্তী যখন তার দিদিকে এবং আমাকে স্পষ্টই বলল যে, দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়া সে আর কাউকে বিবাহ করবে না তখন উক্ত ভাগ্যবানকে দেখবার জন্য আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ ও ঔৎসুক্য হল। কিন্তু যখন শুনলাম সে ব্রাহ্মণ-সন্তান তখন তার দিদির মুখ শুকিয়ে গেল। আমরা কায়স্থ, সুতরাং হিন্দুসমাজে এ বিবাহ ঘটবার নয়। বিষয়টি আরও জটিলতর বোধ হল যখন শুনলাম দেবেন্দ্র ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করবে না। অথচ পাত্র পাত্রীদের ভিতর এক রকম বাক্‌দান হয়ে গেছে। যা হোক্, আমি দেবেন্দ্রকে পত্র দিয়ে নিমন্ত্রণ করে পাঠালাম। নিকটতর পরিচয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না যে, বাসন্তী অনুপযুক্ত পাত্রে আত্মদান করেনি। কিন্তু সমাজ? কোনো দিকেই কূলকিনারা দেখতে পাওয়া গেল না।

*　　*　　*　　*

জানুয়ারী মাস প্রায় শেষ হতে চলল। এই সময়ে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে বার্ষিক মাঘোৎসবের সময় মহিলাদের জন্য নাকি একটি বিশেষ দিন আছে। আমার শাশুড়ী একদিন আমার সামনে শ্বশুর মশায়কে বললেন যে তিনি বাসন্তীকে নিয়ে ব্রাহ্মিকা উৎসব দেখতে যাবেন। মেয়েকে নিয়ে থিয়েটার, বায়স্কোপ, চিড়িয়াখানা, এক্‌জিবিশন্ সবই দেখে বেড়ান, সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজে যেতে আর আপত্তি কি হতে পারে? শ্বশুর মশায় একটু হেসে অনুমতি দিলেন। আমার উপর নিয়ে যাবার ভার পড়ল। আমি ব্রাহ্ম-মন্দিরে কখনও পদার্পণ করিনি। আমার এক ব্রাহ্ম বন্ধু ছিলেন তাঁর কাছে খবর নিতে গেলাম। শাশুড়ী ঠাকরুণের অকস্মাৎ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ পড়ল কেন ভাবতে ভাবতে সন্দেহ হল, বুঝি বা আমাদের মুখে বাসন্তীর কথা শুনে কন্যাকে ব্রাহ্মমতে

বিবাহ দিবার জন্য পথ খুঁজছেন। ব্রাহ্ম বন্ধুটি ব্রাহ্মিকা উৎসবের তিথি ও সময়ের একখানি নির্ঘণ্টপত্র হতে আমাকে দিলেন। আমি তদনুসারে শ্বশ্রূঠাকরুণ ও তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। সেদিন মন্দিরে পুরুষদিগের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং মেয়েরা নেমে গেলে আমি কোচমানকে দেবেন্দ্রের ঠিকানায় আমাকে নিয়ে যেতে হুকুম করলাম। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছে এবং উত্তরোত্তর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাই বেড়েছে। আজ তাঁর সঙ্গে বাসন্তীর বিবাহ নিয়ে কথাবার্তা পাড়ব এই সঙ্কল্প করে তাঁর বাড়ি গেলাম। হ্যারিসন্ রোডের পাশের এক গলিতে তাঁদের বাড়ি। দেবেন্দ্র পিতৃহীন; বিধবা মা, দুটি ছোট ভাই ও একটি বোন নিয়ে তাঁদের ক্ষুদ্র সংসার। পিতা ডেপুটি ছিলেন। যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে সংসারের অসচ্ছলতা ছিল না। আমাকে আসতে দেখে দেবেন্দ্র কতকটা যেন আশ্চর্য্যান্বিত হলেন এবং সাগ্রহে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি দু'চার কথার পরেই বাসন্তীর বিবাহের কথা পাড়লাম। বললাম, তার দিদি ও আমি সকল ব্যাপারই জানি। কিন্তু জানতে চাই, কি মতে বিবাহ হবে। দেবেন্দ্র বললেন, "কেন, হিন্দুমতে ?"

আমি বললাম, "আমরা কায়স্থ, আপনি ব্রাহ্মণ, কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ।"

দেবেন্দ্র অম্লান বদনে উত্তর করলেন, "সব যুগেরই অবসান হয়, কলির পরমায়ুও ফুরিয়ে আসছে। আমরাই নবযুগকে বরণ করে আনব।

আমি। কিন্তু সমাজ সে কথা শুনবে কেন ?

দেবেন্দ্র। জোর করে শোনাব।

আমি। যদি আপনাদের বিবাহ অবৈধ বলে ?

দেবেন্দ্র। মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্যের বিধি দেখাব।

আমি। আপনি ত জানেন, দেশ শাস্ত্রশাসিত নয়, আচারাধীন।

দেবেন্দ্র। আচার দেশকালোচিত না হলে ভাঙব। পুরাতনকে ভেঙেই নূতন আপনাকে গ'ড়ে তোলে।

আমি। আপনি ভাঙবার কে?

দেবেন্দ্র। আমি হিন্দুসন্তান, ব্রাহ্মণ। আমরাই আবহমান কাল ভেঙে গড়েছি এবং গড়ব। যতদিন মূর্চ্ছাপন্ন ছিলাম কাজ বন্ধ ছিল। আমরা আবার জেগেছি।

আমি। দেশের লোক আপনাদের এ বিবাহ স্বীকার করবে না।

দেবেন্দ্র। অস্বীকার করে কার সাধ্য?

আমি। যদি সাধ্যে কুলায়?

দেবেন্দ্র। (পাদুকা ঘর্ষণ করে) ঘাড় ধরে স্বীকার করাব।

আমি হেসে বললাম, "সমাজ কবন্ধ। তার ঘাড় ধরবেন কেমন করে?"

দেবেন্দ্র। এই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে পক্ষাঘাত-গ্রস্তের দুর্ব্বল আস্ফালন নিবারণ করব?

আমি। আপনার শক্তি কি?

ক্ষণকালমাত্র নিরুত্তর থেকে দেবেন্দ্র বললেন,—"বাসন্তী।"

লাবণ্য

কুঁড়ির প্রস্ফুটিত শোভা অথবা শুক্লাদ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার ষোলকলায় পরিণতির ভবিষ্যচ্ছবিখানি যে অভিজ্ঞ দৃষ্টির সম্মুখে জাগিয়া ওঠে সেই দৃষ্টিতে লাবণ্যের নামের সঙ্গে তার ভাবি সৌন্দর্য্যের একটা সুদূর জ্ঞাতিত্ব থাকিলেও অন্ততঃ বর্ত্তমানে তাহার নামের শেষ অংশটির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির সৌসাদৃশটি বেশ সুস্পষ্ট। এই রকম বন্যস্বভাবের মেয়ে আমাদের ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর বড একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু গ্রামের মেয়েদের নয়, তাহার সমবয়স্ক এবং অধিক বয়স্ক বালকদেরও সে সর্দ্দার ছিল। মোড়লী বস্তুটি চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করা যায় না, উহা লইয়াই জন্মাইতে হয়। এই রাজটিকা তাহার কপালে আঁকা ছিল যখন সে ভূমিষ্ঠ হয়।

যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন আমাদের গ্রামে দুইটি কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা আমার শরণাপন্ন হইলেন। আমি তখন কলিকাতায় রিপণ কলেজে ল-লেকচারে হাজ্‌রি দেই অথবা ‘পরস্মৈপদে’ লিখাই এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ পড়ি। পরেশ আমার সহপাঠী ও বন্ধু। ছুটিতে পরেশকে আমাদের বাড়িতে আসিতে অনুরোধ করিলাম, মেয়ে দেখিবার জন্য।

কমলিনী, রূপসী, গৌরবর্ণা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা! তাহার সম্বন্ধে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহাতে আমার আশা ছিল চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইলে পরেশের আর অন্যদিকে চোখ ফিরিবে না। কমলা আমার দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। তাহার সহিত বিবাহ হইলে পরেশকে কুটুম্বিতাসূত্রে বাঁধিতে পারিব, সে আশাও আমার ওকালতিটা

বিলক্ষণ বক্তৃতামুখর করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভাষার সীমার মধ্যে কমলের রূপগুণের অসীমতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

লাবণ্য হরনাথ ভট্টাচার্য্যের কন্যা। গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহাকে ভক্তি করিত এবং তিনি যথার্থই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু এই নিরীহ সদাশিব ব্রাহ্মণের দুরন্ত কন্যাটিকে লইয়া তাঁহাকে এবং গ্রামের সকলকেই হিম্‌সিম্ খাইতে হইত। আশৈশব গ্রামে তাহার দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না। তাহার মা ফিতা দিয়া বিনুনি করিয়া, সাড়ীখানি পড়াইয়া পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলিবার জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। সে ঝোপের কাছে আসিয়া পুরুষের মত মালকোঁচা মারিয়া সাড়ীটি ফিরাইয়া পরিত। বিনুনি খুলিয়া ফেলিয়া অনতিদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মাথা ঝাড়িয়া মুক্ত করিয়া লইত। তাহার পর ছেলেদের সঙ্গে এ বাগান ও বাগান ঘুরিয়া, ফল পাড়িয়া, ডাণ্ডাগুলি খেলিয়া কখনও কখনও মারামারি করিয়া রক্তাক্ত হইয়া বাড়ি ফিরিত। তাহাকে দাবাইয়া রাখিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। শাসন করিলে একেবারে সিংহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিত। বার বৎসরের মেয়েকে গ্রামের সবাই ভয় করিত কিন্তু অন্তরে অন্তরে স্নেহও করিত। গ্রামের পাঠশালায় প্রথম শৈশবে সে ছেলেদের সঙ্গে পড়িত। তাহার পর আমরা যখন গ্রাম-বৃদ্ধদের ধরিয়া একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিলাম তখন সে আমাদের স্কুলের প্রথম ছাত্রীদের একজন। তিন বৎসর স্কুলে প্রত্যেক ক্লাসেই প্রথম প্রাইজ্ পাইয়াছে। আবৃত্তি ও অভিনয়ে তাহার সমকক্ষ গ্রামে কেহই নাই। একবার তার আবৃত্তি শুনিয়া 'স্কুল ইনস্‌পেক্‌ট্রেস্' বলিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার জীবনে এমন সুন্দর আবৃত্তি কোথাও শোনেন নাই। কখনও কাহারও কাছে সে গান শেখে নাই অথচ যাত্রায় শোনা গান দিব্য তানলয়ে গাহিতে পারিত। পালার পর পালার অভিনয় একাই পঞ্চমুখে করিয়া যাইত। আমরা অবাক হইয়া শুনিতাম এবং এই দুরন্ত মেয়েটির ভবিষ্যৎ কল্পনা

করিয়া কোথাও তাহাকে থাপ খাওয়াইতে পারিতাম না। বিজলি বাতির ঔজ্জ্বল্য এবং তাহার পলকাটা কাচের বাতিদানীটি মনোহর হইলেও, যে বাড়িতে তড়িৎ প্রবাহ ধরিবার ব্যবস্থা নাই সেখানে দীপ হিসাবে তাহার কোনো সার্থকতাই নাই। পল্লী গৃহস্থের বাড়িতে মাটির প্রদীপ, হ্যারিকান বাতি, এমন কি হাওয়া-ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প পর্য্যন্ত চলিতে পারে কিন্তু দামিনী দীপিকার স্থান কোথায়? এরূপ পক্ষীরাজ ঘোড়াকে বাঙ্গালীর সংসার যাত্রার ছ্যাকড়া গাড়ীতে জুড়িয়া দিলে আরোহীর পক্ষে কতদূর সুখকর ও নিরুদ্বেগ হইবে তাহা বুঝিতে পারিতাম না। তবে তাহার গুণগ্রাহী যে ছিলাম না তাহা নহে। পরেশকে যখন কন্যা দেখিতে নিমন্ত্রণ করিলাম তখন কমল যে রূপে গুণে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে সে বিষয়ে আমার কোনও সংশয় ছিল না। সরোবরে পদ্ম আর কুমুদ ফুল পাশাপাশি ফুটিয়া থাকিলে পদ্ম ফেলিয়া কুমুদ তুলিতে যায় কে? তবে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যাভার লাঘবের সহায়তা করাও একটা কর্ত্তব্য বটে। আমি লাবণ্যের অনুকূলে যাহা বলিবার পরেশকে বলিলাম। যথা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, লেখাপড়ায় মনোযোগী, বুদ্ধিমতী ইত্যাদি। তার দৌরাত্ম্যের কথা উল্লেখ না করিয়া ঘটক হিসাবে যেটুকু সত্য গোপন করা বিধেয় তাহা করিয়াছিলাম।

* * * *

পরেশ কমলিনীকে দেখিয়া আসিয়াছে এবং পছন্দ করিয়াছে বলিলেই হয়, তবে এখনও কথা দেয় নাই। আমিও বলিলাম যে লাবণ্যকে দেখার পর পাকা কথা দেওয়া যাইবে। বাজার যাচাই করিয়া তবে মনস্থির করা কর্ত্তব্য। পরদিন বৈকালে আমাদের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে যাওয়ার কথা, লাবণ্যকে দেখিবার জন্য। সন্ধ্যার সময় আমি ও

পরেশ পল্লীপথে সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সে আমাকে কমলিনীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছে এবং আমি উত্তর দিয়া যাইতেছি। ফাৎনা বেশ নড়িতেছে, এইবার ছিপে টান দিলেই হয়। ছেলেদের স্কুলের সাম্‌নে ছোট মাঠ। পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম ছেলেরা কবাটি খেলিতেছে। পরেশ থামিয়া সকৌতুকে খেলা দেখিতে লাগিল। একটী ছোকরা, পাৎলা ছিপছিপে শরীর, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরি চুল, তার স্বরে

"চুরে বাংতাং সোনা দিয়ে বাঁধাব ঠ্যাং
মারব ঠ্যাঙের বাড়ী পাঠাব যমের বাড়ী"

হাঁকিতে হাঁকিতে এক দমে ত দুটিকে 'মোড়্‌' করিল এবং তৃতীয়কে লাথি মারিতে উদ্যত হইবামাত্র সে তার পা জড়াইয়া ধরিল ও দুইজনেই ভূতলশায়ী হইল। কিন্তু প্রথমোক্ত ছেলেটি কুমীরের মত দ্রুতবেগে বুকে হাঁটিয়া দ্বিতীয়কে কিছু দূরে টানিয়া লইয়া গেল এবং অবশেষে অবলীলাক্রমে পা ছিনাইয়া লইয়া আপনার কোটে আসিয়া হাঁফ্‌ ছাড়িল। পরেশ সোৎসাহে 'হাততালি' দিয়া, "বাহবা, বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; আমিও যোগ দিলাম।

পাড়ার ছেলেরা আমাকে সকলেই চেনে কিন্তু আমার সঙ্গে অপরিচিত পরেশকে দেখিয়া কুতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করিতে লাগিল। যে ছেলেটি তিনজনকে 'মোড়্‌' করিল তাহার কুনুই দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে দেখিয়া পরেশ একটু ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া গেল এবং তাহার ক্ষতস্থানটি বাঁধিবার জন্য পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল। সে ছোকরা পরেশের উৎকণ্ঠা দেখিয়া, "কিচ্ছু হয়নি" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল এবং এক গোছা দূর্ব্বাঘাস তুলিয়া চিবাইয়া লইল এবং রক্তধারা মুছিয়া কুনুই এর ক্ষত স্থানটিতে টিপিয়া দিতে লাগিল। তার হাতের চেটো রক্তে যেন আল্‌তা মাখা হইয়া গেল।

পরেশ ছেলেটির পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "বাঃ, চমৎকার খেলেছ। তোমার খেলায় ভারী খুসী হয়েছি। আমিও ছেলে বেলায় কপাটি খেলায় আমার দলের First boy ছিলাম। এই নাও তোমার "প্রাইজ" এই বলিয়া বুকের পকেট হইতে fountain penটা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল। ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি বলিলাম, "নেনা পটলি, প্রাইজ পেলি, নমস্কার করে নে, আচ্ছা মেয়ে যা হোক।" পট্‌লি ওরফে লাবণ্য ত কতকটা আড়ষ্ট হইয়া মাথা নীচু করিয়া কলমটি রক্তাক্ত হস্তে গ্রহণ করিল, এক খোলো কোঁকড়া চুল অবগুণ্ঠনের মত তাহার চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িল। পরেশ অবাক্ হইয়া আমাকে বলিল, "মেয়ে নাকি।" তার পর অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "এই বুঝি লাবণ্য।" আমি জনান্তিকে পরেশকে বলিলাম, "এইবার আর ভারত উদ্ধারে বড় দেরী নাই। যখন মেয়েরা কপাটি খেলায় ছেলেদের হারাতে স্বরু করেছে 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।" পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা সহুরে-জীব দেখিলে একটু যেন ভ্যাবাচেকা খাইয়া যায়। দলপতি পরেশের কাছে 'প্রাইজ' পাইল দেখিয়া তাহার এক-ভক্ত উৎসাহের সঙ্গে পরেশকে বলিল, 'ও স্কুলের First-Boy, বছর বছর 'প্রাইজ' পায়।' আর এক ভক্ত তার ভুল সংশোধন করিয়া বলিল, 'দেৎ, Boy কিরে? ও যে মেয়ে?' ছেলের দল তখন আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর একটি ছেলে পিছন থেকে সরুগলায় হাঁকিল, "পট্‌লিদি 'পঞ্চনদীর তীরে' হাত নেড়ে বল্‌তে পারে।" আমি দেখিলাম লাবণ্যর যাহা কিছু গুণপণা তা'সে স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা পরেশের কাছে বেশ ভাল করিয়াই ব্যাখ্যা করিতেছে। প্রজাপতি আমার গাফেলি দেখিয়া বোধ হয় আমাকে ঘটকের পদ থেকে বরখাস্ত করিলেন। আমি লাবণ্যকে বলিলাম, 'একবার আমাদের শুনিয়ে দেনা, আবৃত্তি করে'। ছেলের দল মহোৎসাহে সর্দ্দারকে কবিতাটি আবৃত্তি

করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। লাবণ্য দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাড়াতাড়ি কৃষ্ণচূড়ার মত করিয়া তার চুলগুলি বাঁধিয়া লইয়া আরম্ভ করিল,

"পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ্
নির্ম্মম নির্ভীক।"

সূর্য্যাস্তের আভা ঠিক সেই সময়ে লাবণ্যর মুখের উপর এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি ঢালিয়া দিল। আমি শিশুকাল হইতে লাবণ্যকে দেখিয়াছি। কখনও তাহার মুখখানি এমন সুন্দর, এমন গৌরবমণ্ডিত মনে হয় নাই। হঠাৎ মনে হইল বাঙালীর ঘরে ঘরে এরূপ সুস্থ সবল আবেগ-চঞ্চল দামাল মেয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহারাই পুরুষের শক্তিস্বরূপিনী ও বীরপ্রসবিনী হইবে, ইহাদেরই মাতৃক্রোড়ে ভারতের নবজীবন ও নবযুগ ভূমিষ্ঠ হইবে।

* * * *

রাত্রে আহারাদির পর পরেশ আর আমি ছাদে গিয়া বসিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, শরতের শুক্লাদ্বাদশী। এই মরা বাংলার বুকে বুঝি এই সময়টাতে একটু প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া ওঠে। আমাদের ঘরে ঘরে আগমনীর সুর দিন দিন যতই থামিয়া আসুক না,এখনও এই কয়টি দিনের জন্য আকাশে বাতাসে, নদীর জলধারায়, পল্লীর মাঠে ঘাটে, তরুপল্লবে উৎসব সঙ্গীত বাজিয়া উঠে আবার সম্বৎসরের মত নীরব হইয়া যায়।

পরেশ চুপটি করিয়া এই জ্যোৎস্না রাত্রির নিঃশব্দ রাগিণীটি যেন শুনিতেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমাদের গ্রামের জংলি মেয়েটিকে পছন্দ হ'ল নাকি?" সান্ধ্যভ্রমণের পর বাড়ী ফিরিবার পথে পরেশ আর কমলের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে নাই, লাবণ্যর সম্বন্ধেও না। অনেক দিন পূর্ব্বে পরেশ একবার তাহার কাকার সহিত হরিহরছত্রের মেলা দেখিতে গিয়াছিল। সেই মেলাতে তাহার কাকা ঘোড়া কিনিতে গিয়াছিলেন। একটি ছোট ঘোড়া, পাৎলা ছিপ্ ছিপে, লম্বা সরু মুখ, কান খাড়া করিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া নাক ফুলাইয়া, আলুলিত দীর্ঘ পুচ্ছটি দুলাইয়া বার বার তাহার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছিল। তাহার কপালের উপর একগুচ্ছ কেশর কান দুটির অবকাশের মধ্য দিয়া প্রায় চোখ পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িতেছিল। লাবণ্যকে দেখিয়া অবধি সেই ঘোড়াটির কথা বার বার পরেশের মনে জাগিতেছিল। সেই সুবঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী, সর্ব্বদেহে স্পন্দিত শৃঙ্খলিত গতি, সেই উৎকর্ণ সন্ধান তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি। পরেশ আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তুমি কখনও কোনো জানোয়ারের মুখের ভাবের সঙ্গে মানুষের মুখের ভাবের যে আশ্চর্য্য আদোল থাকিতে পারে এটা লক্ষ্য করেছ?"

আমি বলিলাম, কই, আমার চোখে ত কখনও ঠেকে নাই।

পরেশ। তাহলে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না।

আমি। কেন, লাবণ্যকে বনের হরিণ বলে মনে হ'ল নাকি?

পরেশ। না হে না, আমি কবিত্ব করছি না। হরিহরছত্রের মেলায় একটি ঘোড়া দেখেছিলাম। লাবণ্যকে দেখে অবধি আমার বার বার কেবলি তারি কথা মনে হচ্ছে কেন বলতে পারি না।

আমি। কতদিনের কথা? যদি বার বৎসরের আগে হয়, তা'হলে হয়ত সে অশ্বিনী-নন্দিনী হাটের ভিড়ে তোমাকে দেখে জন্মান্তরে তোমাকে পাবার জন্য হটযোগে দেহ ত্যাগ করেছিল এবং সেই পুণ্য

ফলে এ জন্মে আমাদের গ্রামে ভট্‌চার্জ্জি বামুনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে।

পরেশ। অসম্ভব কি ? প্রাণ জিনিষটার যদি একটা দেহাতিরিক্ত সত্ত্বা থাকে তবে কর্ম্মফলানুসারে বিভিন্ন জীবদেহে সে প্রাণটি আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অনুকূল বাসস্থান খুঁজে নেবে তা' ত আমার কাছে নিতান্ত আজ্‌গুবি বলে মনে হয় না। আর যদি প্রাণ বস্তুটির দেহের সঙ্গেই লোপাপত্তি হয়, তা' হলেও, প্রাণী মাত্রেরই প্রাণের একটা বহির্লক্ষণ ফুটে ওঠে। সেই লক্ষণের ভিতর পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের হয়ত কোথাও সুগভীর সুরের মিল আছে। বিভিন্ন যন্ত্রে একই সুরের মত সমতার ঝঙ্কার বেজে ওঠে। এমন কি লোহার এঞ্জিনের মধ্যেও ইঞ্জিনিয়ার Horse Power প্রত্যক্ষ করেন তার প্রগতির ভিতর। ধনুকের সুবঙ্কিম রেখাটিতে লক্ষ তীরের ক্ষিপ্র গতির অক্ষয় তূণ সঞ্চিত হয়ে আছে। বেদুইন্ ঘোড়ার প্রতি পদক্ষেপে, গ্রীবা ভঙ্গীতে, হ্রেষা-রবে, নাসাবিস্ফারণে, দোদুল চঞ্চল পুচ্ছটিতে আরব প্রান্তরের মরু যাত্রার ধূলিমেঘলুণ্ঠিত বিদ্যুৎগতি যেন ঘনীভূত হয়ে তার তন্বীদেহ লতাটিকে আকার দান করেছে। এই মেয়েটিকে দেখে মনে হয় ও যেন ঊনপঞ্চাশ বায়ুর জমাট বারুদে তৈরী হাউই। আগুনের স্ফুলিঙ্গ ওর মুখে যেদিন লাগবে, সেদিন আলোকের রেখা পথ ধরে তারাও ঊর্দ্ধে উঠবে যারা ওকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারবে।

গৃহস্থের ঘরে দীপশিখার হিসাবে লাবণ্যর যোগ্যতা কতখানি সে কথা ভাবিয়াছিলাম বটে কিন্তু হাউই-এর মত ঊর্দ্ধলোকে টেনে নিয়ে যাওয়ার শক্তিরূপিনী দীর্ঘায়মানা বহ্নিশিখা রূপে তাহার মূর্ত্তি কখনও কল্পনা করি নাই। তবে বেশ বুঝিলাম সকালে যে কমলটি পরেশের চিত্ত সরোবরে ফুটিয়াছিল সে "কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে"এবং এই লাবণ্যের বন্যাজলে পরেশনাথ হাবুডুবু খাইতেছেন। ছেলেবেলাকার কপাটি খেলার স্মৃতি কি

ভাবী বধূনির্ব্বাচনে এমন করিয়া বরমাল্যরূপে দেখা দিতে পারে? একেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! আমার ঘটকালি বুঝি ফাঁসিয়া যায়। পরেশের প্রকৃতি জানিতাম তাই তাহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা না করাই এ ক্ষেত্রে সমীচীন বোধ করিলাম এবং প্রফুল্ল মুখে বলিলাম, 'বেশত, কাল ভট্‌চাযি মশায়ের বাড়ী গিয়ে মেয়ে দেখে কথা দিয়ে আসা যাবে।'

*　　*　　*　　*

আজ ভোর হইতে লাবণ্যর মার আর বিরাম নাই। রিক্ত-সজ্জা গৃহখানি স্বহস্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, 'হইলে হইতে পারে' এ হেন ভাবী জামাতার ও তাহার বন্ধুর জন্য মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া প্রতি-বেশিনীদের আনুকূল্যে লাবণ্যের আপাদ মস্তক প্রসাধনটি অনবদ্য করিয়া, কম্পিত হৃদয়ে তিনি আমাদের শুভাগমনের পথ চাহিয়াছিলেন এবং বার বার দেবতার নিকট মাতৃহৃদয়ের আকুল প্রার্থনা নীরবে নিবেদন করিতে-ছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও উন্মনা। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তাঁহার প্রসন্ন মুখে কেমন একটা বিষাদকরুণ গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কন্যাকে কাছে টানিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "দেখো মা আমার, আজ একটু শিষ্ট শান্ত হয়ে থেকো। প্রশ্ন করলে সহজ সরলভাবে উত্তর দেবে, অবাধ্য হোয়ো না। দেখো মা, তোমার আচরণে যেন আমাদের মাথা হেঁট্ না হয়।" লাবণ্য বলিল, "বাবা, আমি ত মাকে কত করে বল্লাম যে আমি এখন বিয়ে করব না তবু আমাকে জোর করে তোমরা বিয়ে দিতে চাও কেন?" পিতা। "ছিঃ মা, ও সব কথা কি মুখে আনতে আছে! তুমি এখন বড় হয়েছ। এ বয়সেই ত আমাদের ঘরে মেয়েদের বিবাহ হয়। তোমার মার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয় তখন তিনি তোমার চেয়েও এক বছরের ছোট ছিলেন। তা ছাড়া ওরা সুধু আজ তোমাকে দেখতে আসছে। এখনি ত আর বিয়ে হচ্ছে না, আর ওখানেই যে হবে এমন কথা কিছু নাই। ওখানে যদি বিয়ে না হয় তা হলেই বা ক্ষতি কি?

কত ভাল পাত্র আছে, আমরা দেখে শুনে তোমার জন্য আর একটি সৎ পাত্র আনব।"

লাবণ্য কতকটা অসহিষ্ণু মিনতির স্বরে বলিল, "না বাবা ওদের আসতে বারণ করে দাও। আমার এখন বিয়ে করতে ইচ্ছা নাই। আমি তোমাদের ছেড়ে কিছুতেই পরের বাড়ি যেতে পারব না।" পিতা। "দূর পাগলি, পরের বাড়ি কি রে। সেই ত তোমার আসল বাড়ি মা! আমাদের কাছে ত দুদিনের অতিথি হয়ে এসেছ।" ভট্টাচার্য্যের আয়ত লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। "লক্ষ্মী মা আমার, তোমার বাবার কথা অনুসারে চোলো! যদি আবৃত্তি করতে বলেন ত "গঙ্গাস্তোত্র"টির আবৃত্তি কোরো হ্রস্ব-দীর্ঘের যেন ব্যতিক্রম না হয়। যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণটি হ্রস্ব না দীর্ঘ বলত মা।" লাবণ্য হাসিয়া উত্তর করিল, "মনে আছে বাবা, "বর্ণ সংযোগ পূর্ব্বশ্চ" দীর্ঘ;" পিতা প্রসন্ন হইয়া কন্যাকে অব্যাহতি দিলেন।

পাড়ার ছেলে মেয়েরা আজ আর লাবণ্যের নাগাল পায় নাই। প্রতি-বেশিনীরা সকলেই সদুপদেশের তণ্ডুল মুষ্টিতে লাবণ্যের সুবুদ্ধির হাঁড়ি প্রায় কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়াছেন। এদিকে রোদ পড়িয়া আসিল, আমি ঘড়ি দেখিয়া পরেশকে বলিলাম, চল এবার ভট্টাচার্জ্জি মশায়ের বাড়ী যাবার সময় হল। পরেশ প্রস্তুতই ছিল, বলিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল, আমরা কনে দেখিবার জন্য শুভ যাত্রা করিলাম।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি। কিছুক্ষণ হইল তিনি আমাদের বসাইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়াছেন আমাদের আগমন সংবাদ দিবার জন্য, এখনও ফিরেন নাই। একটা অস্ফুট কলরব যেন ভিতর হইতে উঠান পার হইয়া আমাদের কানে আসিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম আমাদের দেখিবার জন্য প্রতিবেশিনীরা বোধ হয় অন্দরে জটলা করিয়াছেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গলায় 'কি সর্ব্বনাশ!' এই

কথা সুস্পষ্ট আমার কানে আসাতে উদ্বিগ্ন হইলাম এবং পরেশকে বসাইয়া উঠান পার হইয়া অন্দরের দিকে চলিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল যে লাবণ্য পালাইয়াছে। বড় রাস্তার উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভৃত্যকে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন, দূর হইতে আমাদের আসিতে দেখিলেই যেন বাড়ি আসিয়া খবর দেয়। সংবাদ পাইবামাত্র উপস্থিত সকলেই যে-ঘরে মেয়ে দেখান হইবে সেই ঘরে ছুটিয়া আসিলেন কারণ সেই ঘরের জানালা দিয়া বহির্বাটি দেখা যায়। সকলেই পরেশকে দেখিবার জন্য উৎসুক এবং তাই তাঁহাদের হুড়াহুড়ি করিয়া এই ঘরে আসা। এদিকে পরেশের 'বেতুইন্ ঘোড়া' অবসর বুঝিয়া উঠানের খিড়কির দরজা খুলিয়া আম বাগান পার হইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া একেবারে ছেলেদের স্কুলের ছাদে গিয়া আশ্রয় লইল। ছাদে উঠিবার পাকা সিঁড়ি ছিল না। বর্ষার পর বাড়ীটির জীর্ণ সংস্কার চলিতেছে; চারিদিক ঘেরিয়া ভারা বাঁধা এবং ছাদে উঠিবার বাঁশের সিঁড়ি লাবণ্যকে তুলিয়া লইবার জন্য বংশ-পঞ্জর পাতিয়া রাখিয়াছিল। ছাদে উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনুচ্চ আলিসার পাশে লাবণ্য শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ হইল মজুররা সেদিনকার মত কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। লাবণ্যর এই দ্রুত পলায়ন কাহারও চোখে পড়ে নাই অথবা পড়িয়া থাকিলেও এ বাড়ীতে সে খবর পৌছিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বাড়ীর অদূরেই পুষ্করিণী, কন্যা কি বিবাহের ভয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিল। দেখিতে দেখিতে পল্লীময় এ সংবাদটি আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাহিরে আসিয়া আমাদের কাছে জোড় হাত করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। পরেশ ব্যাপারটিকে অতি তুচ্ছ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং কন্যা-বঞ্চিত এই শ্বশুর-পদপ্রার্থী মন্দভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাটিকে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইবার জন্য বাবংবার করজোড়ে মিনতি করিতে লাগিল। সে তাঁহাকে বলিল

যে তাহার ছোট বোনটিও তাহাকে বরপক্ষীয়েরা দেখিতে আসিবার সময় ঠিক এমনি করিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরে খিল দিয়াছিল এবং তাঁহারা না চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত খিল খোলে নাই। তাহার ছোট বোনের সম্বন্ধে এ অপবাদটি কিন্তু পরেশের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সার্টিফিকেট মাত্র ; যেহেতু তাহার কনিষ্ঠ ভগিনী আজ পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয় নাই। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ পরেশের বিনয় বাক্যে কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বার বার ক্ষমাভিক্ষা করিয়া কন্যার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। আমি পরেশকে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। লাবণ্যের জন্য কিন্তু উভয়ের মনই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় আমি পরেশকে বলিলাম, তুমি একটু বোসো আমি একবার ভট্টাচার্জ্জি মহাশয়ের বাড়ীর থেকে খবর নিয়ে আসি—মেয়েটাকে পাওয়া গেল কি না। তোমার 'হাউই'-এর পা-কাঠিটি যদি শক্ত করে ধরতে পারতে তা হ'লে শিবের ষাঁড়ের ল্যাজ ধরে স্বর্গে যাবার মত তোমার ঊর্দ্ধলোক প্রদক্ষিণ করে আসা হ'ত। পরেশ হাসিয়া বলিল, "Better luck next time" অর্থাৎ এবার না হয় হাত ফস্‌কালো আর একবার মুঠার ভিতর পাওয়া যাবে। এক ফাগুনে বসন্ত ফুরায় না।

*   *   *   *

আমি চলিয়া গেলে একটু পরেই পরেশ সোজা রাস্তা ধরিয়া সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইল। গতকল্যের মত স্কুলের পাশ দিয়া যাইবার সময় লাবণ্যের কপাটি খেলার দৃশ্যটি, অস্তরবির কনকাঙ্গুলি-সিক্ত গ্রাম্য-বালিকার সরল নির্ম্মল মুখকান্তি এবং 'পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে'র নিঃশব্দ প্রতিধ্বনিটি তাহাকে কতকটা আকুল করিল। পরেশ দাঁড়াইয়া শূন্যমাঠের দিকে কিছুক্ষণ নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল। স্কুলের ছাদের উপর ত্রয়োদশীর চাঁদ আপনার শুভ্র হাসিতে আকণ্ঠ ডুবিয়া কৌতুক দৃষ্টিতে যেন পরেশের মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছে। হঠাৎ আলিসা শূন্য ছাদের উপর কে যেন দাঁড়াইয়া আছে মনে হইল। পরেশের

কল্পনাই হউক আর যাহা-ই হোক, আবছায়াটি যেন নারীমূর্ত্তি বলিয়া পরেশের মনে সন্দেহ হইল। সে একটি গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। সত্যই ত সাড়ীপড়া অনবগুণ্ঠিত মূর্ত্তিটি বড় রাস্তার দিক হইতে তাহার বিপরীত দিকে ধীরে অগ্রসর হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পরেশ স্কুলবাড়ীটি ঘুরিয়া উল্টা দিকে যখন গিয়া পৌছিল তখন দেখিতে পাইল মূর্ত্তিটি বাঁশের সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে পিছন ফিরিয়া নামিতেছে। পরেশ সিঁড়ির অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। আট দশটা বাঁশের ধাপ বাকী থাকিতে থাকিতেই মূর্ত্তিটি হঠাৎ ফিরিয়া একলম্ফে মাটিতে অবতীর্ণ হইল, কিন্তু লম্ফের বেগ সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে পরেশ যখন তাহাকে ধরিয়া তুলিল তখন উভয়ের হাসিমুখের উপর আকাশের চাঁদ অনেকখানি হাসি ঢালিয়া দিল। পরেশ বলিল, 'চল তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি'। 'না, আমি একাই যেতে পারব, আপনাকে যেতে হবে না', এই বলিয়া সে ছুটিবার উপক্রম করিতেই পরেশ চট্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি তোমার বাবাকে বলে এসেছি যে, যদি আমি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি তা হ'লে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তোমাকে কখনো জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবেন না। আর 'চোর' 'চোর' খেলতে গিয়ে যখন আমার কাছে ধরা পড়েছ তখন ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলে কি ঠিক খেলা হয়, কি বল?"

আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীর ভিতর হইতে খবর পাইয়া বড় দুর্ভাবনা লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমার সঙ্গে সঙ্গে কি উপায় করা যাইবে এই বিতর্ক করিতে করিতে খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময় অদূরে দুজনকে আসিতে দেখিয়া আমি হাঁকিলাম, কেও? বড় বড় গাছের ছায়ায় তাহাদের ঠিক্ চিনিতে পারা যাইতেছিল না। পরেশ উত্তর করিল,"কে? অক্ষয় নাকি? ভট্টাচার্য্য

মশাইকে দাঁড়াতে বল, আমি লাবণ্যকে ধরে এনেছি।” লাবণ্য একছুটে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। জ্যোৎস্নালোকে আমরা তিনজনে দাঁড়াইলাম। পরেশ ভট্টাচার্য্যের পদধূলি লইয়া বলিল, ‘আমি লাবণ্যকে আশ্বাস দিয়াছি যে আপনি কখনো তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিবেন না। আর, আর যদি কখনো তাহার মত হয় তাহা হইলে— পরেশের কথা শেষ হইল না, ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেছে। পরেশ এখন কলেজের প্রফেসর, পূজার ছুটিতে সস্ত্রীক আমাদের গ্রামে তার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। আমার সে দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। আহারাদি পর গল্প করিতে করিতে রাত্র প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। আমি লাবণ্যের হাতে-সাজা আর দুটি পান মুখে গুঁজিয়া, তাহার নিপুণ হস্তের তাম্বুল রচনার সুখ্যাতি করিতে করিতে বাহির হইলাম, পরেশও আমার সঙ্গ নিল, লাবণ্য আসিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে বলিল, এসনা, আমাদের সঙ্গে, অক্ষয়কে একটু এগিয়ে দিই। লাবণ্য অমনি আসিয়া আমাদের সঙ্গে জুটিল। রাত্রি জ্যোৎস্না-ময়ী, শুক্লা ত্রয়োদশী। সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার শুক্লা ত্রয়োদশীর কথা আমার মনে পড়িল। আমি লাবণ্যকে বলিলাম, “মনে আছেরে পটুলি, এমনি আর এক ত্রয়োদশী তিথিতে পরেশ তোকে ধরে এনেছিল?” আকাশের চাঁদ আমার কথা শুনিয়া যেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াও চোখের কোণ দিয়া বেশ দেখিতে পাইলাম পরেশ লাবণ্যের হাতখানি আপনার হাতের ভিতর লইল। লাবণ্য হাতখানি ছিনাইয়া লইতে গিয়া চুড়ির টুং ঠাং বাজাইয়া ফেলিল। পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনা করিতে করিতে আমরা তিন জনেই অগ্রসর হইয়া ছেলেদের স্কুলের কাছে আসিয়া

পৌঁছিলাম। সরকারী বাড়ী, পাঁচ বৎসর পরে আবার P. W. D. র পাঞ্চবার্ষিক জীর্ণ সংস্কার। বাড়ীখানি সেই পূর্ব্বেকার মত আবার আপাদমস্তক বাঁশের ভারার জাল মুড়ি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ হঠাৎ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—চল লাবণ্য, একবার স্কুলের ছাদে গিয়া ওঠা যাক্ কি বল। আমি বল্লাম, বাঃ Capital idea, চল তিন জনেই ওঠা যাক্—বলিয়া আমি মালকোঁচা মারিয়া গরদের চাদরখানি কোমরে জড়াইলাম। আমার দেখা দেখি পরেশও আপনার কোঁচা সামলাইয়া লইল। লাবণ্য ইতস্তত করিতে লাগিল। কিন্তু পরেশ ছাড়িবার পাত্র নয়। লাবণ্য মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া দিব্য করিয়া আঁচলখানি কোমরে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, তোমরা ওঠো, আমি পিছনে উঠছি। আমার আগেই পরেশ উঠিতে আরম্ভ করিল, আমি তাহার পশ্চাতে, এবং লাবণ্য আমার পিছু লইল। তিনজনেই একসঙ্গে উঠিতে লাগিলাম। নির্ব্বিঘ্নে ত ছাদে পৌঁছান গেল। জ্যোৎস্না যামিনী যেন শুভ্রপালঙ্কে বাসর শয্যাখানি পাতিয়া রাখিয়াছে। আমি পকেটে হাত দিয়া "ঐ যাঃ, আমার purseটা বোধ হয় সিঁড়ি ভাঙবার সময় পড়ে গেছে, একখানা ১০০৲ টাকার নোট ওর ভিতর আছে। পথে আসবার সময় বুকের পকেটে ছিল বেশ মনে আছে।" এই বলিয়া ত আমি আমার টাকার বটুয়ার সন্ধানে সিঁড়ি ভাঙিয়া নামিতে নামিতে বলিলাম, "আর সিঁড়ি ভাঙ্‌তে পারব না। একবার উঠ্‌তে গিয়ে ত আমার হৃৎপিণ্ডর উপর থেকে purseটা খসে পড়ে গেল। দ্বিতীয়বারটা আবার তার ভিতর থেকে পরমায়ুটা না ফস্‌কায়। আমি নীচে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি, তোমরা নেমে এলে পর যাব।" কুঞ্জগৃহের দৌবারিক পদে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটক ঠাকুরকে বাহাল করা গেল।

সিঁড়ির শেষ ধাপটির উপর বসিয়া চাঁদের পানে চাহিলাম। ফুরফুরে হাওয়া তার অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধি রুমালখানি যেন আমার নাকের কাছে

ঘুরাইতে ছিল। দূরে একটা পাপিয়ার গান থাকিয়া থাকিয়া জ্যোৎস্নার উপর সুরের শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল। একটি বিস্মৃতপ্রায় শ্লোক মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল। মৃদু গুঞ্জনে সেটি আবৃত্তি করিলাম।

"যঃ কৌমারহরঃ সত্রব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ !"

ফুলকপি

আফিসে যাইবার সময় গৃহিণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—যেন ফিরিবার সময় একজোড়া ফুলকপি কিনিয়া আনিতে না ভুলি। যথেষ্ট অনুনয়, অনুযোগের সহিত, যেহেতু তাঁহার বহুপুনরুক্তি সত্ত্বেও আমি অনেক সময়ে তাঁহার হুকুম তামিল করিতে "ভুলিয়া" যাই। নবশিশিরাগমোদ্ভিন্ন পীনকঠিন উক্ত উদ্ভিজ্জকোরক রচিত অমৃত ব্যঞ্জনের সুরসাল বর্ণনায় আমাকে নিতান্ত লোভাতুর করিয়াও তিনি নিবৃত্ত হইলেন না; আমার চাদরের কোণে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ একটি 'গেরো' বাঁধিয়া দিলেন। আমার স্মৃতিদৌর্ব্বল্যের এই অমোঘ নিদর্শনটি উত্তরীয় প্রান্তে ধারণ করিয়া গৃহিণীর মিষ্ট ভর্ৎসনা ও মৃদু পরিহাসের অনুরণন পান ও বিঁড়ির সহিত সেবন করিতে করিতে, দশ বাজিতে পাঁচ মিনিটের সময় আফিসে স্বস্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। মাসান্তে মাত্র বত্রিশটি মুদ্রা যাহার বেতন, গৃহিণীর ফরমাইস্ সম্বন্ধে প্রখর স্মৃতিশক্তি তাহার পক্ষে সব সময়ে খুব সুবিধাজনক নয়। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে অনেক সময় "ঐ যাঃ, ভুলে গেছি"র শরণাপন্ন হইতে হইত। গৃহিণী যে একেবারে বুঝিতেন না, তা' নয়। আমার এই নিষ্ফল মিথ্যা কথাটির অন্তরালে, তাঁহাকে তুষ্ট রাখিবার জন্য আমার যে কতখানি উৎকণ্ঠা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। এই আর্থিক অক্ষমতার সঙ্গে যে আমার হৃদয়ের কার্পণ্য নাই, এই বিশ্বাসের কথা তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি কৃত্রিমকোপের আস্ফালনের ভিতরও আমাকে আশ্বস্ত করিত। কিন্তু যে দিন তিনি আমার চাদরে 'গেরো' দিতেন, সে দিন আর আমার অব্যাহতি ছিল না। যেমন করিয়াই হোক্, সে

দিন তাঁহার অনুরোধ বা আদেশ পালন করিতেই হইত। যদিও ৫ টার সময় আইনতঃ আমাদের আফিস বন্ধ হইবার কথা, কিন্তু বড় সাহেব ও তাঁহার সহকারী উপ-সাহেব কয়েকজন ব্যতীত আর কাহারও আইন অনুসারে ছুটি পাইবার অধিকার ছিল না। শুনিয়াছিলাম, একবার আমাদের আফিসের কয়েকজন মিলিয়া নাকি যথাসময়ে ছুটি পাইবার জন্য একটি আর্‌জি পেশ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বড় সাহেব তাঁহাদের এই নিতান্ত অযৌক্তিক আব্‌দারের ধৃষ্টতা যথাযোগ্য প্রমাণ করিয়া উপসংহারে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন যে, যেহেতু "বাবু"দের দীর্ঘসূত্রতা সর্ব্বজনবিদিত অবিসংবাদী সত্য, এবং কাজে ফাঁকি দিবার শক্তিও অনন্যসাধারণ, সে হেতু ঘণ্টা হিসাবে মাহিয়ানা পাইবার অধিকার তাঁহাদের নাই। সুতরাং দৈনিক 'ফুরণ' হিসাবে তাঁহাদের যে কাজ করিতে দেওয়া হয়, ইহা তাঁহাদের প্রতি কোম্পানীর অনুকম্পা মাত্র। বাবুদের এই কর্ম্মশৈথিল্যের জন্য আলোর বন্দোবস্ত রাখিবার অনাবশ্যক ব্যয়ভার কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইতেছে, এ কথা "বাবু"রা যেন ভুলিয়া না যান। মোট কথা, আমাদের মত একদল কুপোষ্য প্রতিপালন করিবার জন্যই যে, "গ্যালেন ক্যাম্প্" কোম্পানী তাঁহাদের অন্নসত্র ও সদাব্রত খুলিয়াছেন, সে কথা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। যাঁহারা দরখাস্ত দিয়াছিলেন, তাঁহারা নাকখৎ দিয়া সাহেবের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া আসিলেন এবং সভয়ে সাহেবকে জানাইলেন যে আজকালকার রাজনৈতিক আন্দোলনকারী কুচক্রীদের প্ররোচনায় পড়িয়া তাঁহাদের এই দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল। সাহেব রাজভক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের একটি সারগর্ভ উপদেশ দান করিলেন এবং পতিত ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার স্বজাতির কিরূপ অযাচিত করুণা, ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রাঞ্জলরূপে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বাবু-বৃন্দ যখন সেলাম করিয়া বিদায় লইতেছিলেন, তখন আবার তাঁহাদের ফিরাইয়া গম্ভীর

স্বরে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিলেন। বাবুরা পুনশ্চ নিবিড়তর সেলামের দ্বারা আপনাদের গভীরতর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে স্ব স্ব আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরের মেলেই বিলাতের বড় আফিসে টীকাটীপ্পনি সহ কেরাণী বাবুদের ধর্ম্মঘটের বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত হইল এবং সেই সঙ্গে এই সহরের কোনও বিলাতী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত উক্ত ঘটনার বিবরণ এবং তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে কীর্ত্তিত আমাদের বড় সাহেবের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃঢ়তা ও ঔদার্য্যের ভূয়সী ব্যাখ্যা সম্বলিত অভিমত প্রেরিত হইল। শীঘ্রই সম্বাদ আসিল যে বোর্ডের বিশেষ অধিবেশনে আমাদের বড় সাহেবের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। বিধাতার মঙ্গলময় রাজ্যে অশুভের ভিতর শুভ এই রূপেই অনেক সময়ে আপনাকে প্রকটিত করে! আমার সবে অল্প দিনের চাকুরী—এই ঘটনা শুনিয়া পাঁচটার সময় ছুটির আশা অন্ততঃ বর্ত্তমান কেরাণী জন্মের মত জলাঞ্জলি দিলাম। বাড়ী ফিরিতে এক একদিন রাত্রি আটটা নয়টা বাজিয়া যাইত এবং ইহা লইয়া গৃহিণীর নিকট জবাবদিহি করিতে গিয়া অনেক সময়ে দাম্পত্য-কলহের একপালা প্রহসন অভিনীত হইয়া যাইত। কারণ আমার চাকুরী হইবার সময় তিনি নাকি শুনিয়াছিলেন যে আমার দশটা পাঁচটা আফিস এবং উপরি দুপয়সাও আছে। কিন্তু এই জনশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কোনও সামঞ্জস্য দেখিতে না পাইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অধীর হইয়া উঠিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পিত্রালয়ের প্রতিবেশী মদন মুখুজ্জের জামাতা পঁচিশ টাকা মাহিয়ানা সত্ত্বেও তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ক্রমশঃ স্বর্ণালঙ্কারে পূর্ণাঙ্গিণী করিয়া তুলিতেছে—ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ যখন বর্ত্তমান, তখন কেবলমাত্র আমার মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করা এবং চির-দারিদ্র্যের দুঃসহভার নীরবে বহন করিয়া চলা তাঁহার পক্ষে যে নিতান্ত অনায়াসসাধ্য ছিল, সে কথা বলিতে পারি না। এই অকাট্য যুক্তির

সদুত্তর দিতে না পারিয়া যখন গৃহিণীর আরোপিত সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া লইতাম এবং আমার মত অযোগ্যের সহিত বিবাহ না হইয়া উক্ত মুখোপাধ্যায়ের জামাতার হস্তে তাঁহার জীবনযৌবন দান করিলে তিনি যে চতুর্ব্বর্গের অধিকারিণী হইতেন, সেই জন্য সকাতরে অনুশোচনা করিতাম, তখন তিনি হার মানিয়া আমার এই বত্রিশ মুদ্রায় লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য গণিতেন এবং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু তপস্যার ফলে যে এই সুদুর্লভ স্বামীরত্নটিকে লাভ করিয়াছেন, এবং জন্মজন্মাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন এই ভরসার কথায় আমাকে আশ্বস্ত করিতেন। বলিতে কি, মধ্যে মধ্যে এইরূপ কলহের ব্যায়ামে আমাদের দাম্পত্য সম্বন্ধটি বিলক্ষণ পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হোক, সেদিন আটটার সময় আফিসের দেরাজে চাবি দিয়া, দরওয়ানের নিকট গচ্ছিত আমার ছাতাটি বগলে লইয়া ধীর পদসঞ্চারে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। গৃহিণীর স্মারক গ্রন্থিটির কথা ভুলি নাই। বৎসরান্তে আবার ফুলকপির ডাল্‌না খাইবার প্রলোভন আমার ক্ষীণ-গতিকে ক্ষিপ্র করিয়া তুলিল। কমা, সেমিকোলান্‌-বিহীন, সমস্ত দিন-ব্যাপী অনবচ্ছিন্ন কলম পেশার পর শ্রান্ত পথের একমাত্র পাথেয়, গৃহিণীর মুখারবিন্দস্মরণ। শ্রীমুখপঙ্কজের ধ্যান-স্রোতে আমার কর্ম্মক্লান্ত দেহ তরীখানিকে ভাসাইয়া দিয়া প্রত্যহ আহীরিটোলার একখানি স্নিগ্ধ প্রদীপোজ্জ্বল দ্বিতল বাড়ীর খেয়াঘাটে উত্তীর্ণ হইতাম। আজ কেবল-মাত্র সেই স্রোতের টানে নয়, বহু উপবাসের পারণা, বহু প্রত্যাশিত শীতপোলব্ধ ফুল্ল ব্যঞ্জনের গরম মসলা-সুবাসিত সৌরভ, পালের হাওয়ার ন্যায় নব প্রেরণায় আমার মন্থর তরীখানিকে সবেগে গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল।

হাওড়ার পুলের কাছে আসিয়া হ্যারিসন রোডের ফুট পাথের উপর ফুলকপি-ওয়ালিরা পথ আলো করিয়া বসিয়া আছে, দেখিলাম। নিটোল

বর্ত্তুল, অর্দ্ধ পরিস্ফুট, সদ্যোবিকশিত ফুলকপির শুভ্র মাধুরী আমাকে মুগ্ধ করিল। বিশেষত শ্যাম পত্রান্তরালরক্ষিত অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত সলাজ অথচ সুপ্রকটিত সুষমায় আমাকে আরও বিচলিত করিল। যাহা হোক্, এই চিত্ত-চাঞ্চল্য গোপন করিয়া নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে নিকটস্থ পসারিণীকে এক জোড়ার মূল্য কত, ভর সন্ধ্যার সময় দরদস্তর না করিয়া এক কথায় বলিতে বলিলাম। আমার মুখের দিকে চাহিয়া, একগাল হাসিয়া সে বলিল—"বড় বাবুর সঙ্গে বৌনির সময় আর 'মূলাই' কি করব, আটগণ্ডা পয়সা দিবেন।" আমি কিছু না বলিয়া পাঁচ দুগুণে দশটি আঙ্গুল দেখাইলাম, অর্থাৎ দশ পয়সা। অবশেষে চারি আনায় রফা হইল। চাদরে গেরো দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পকেটস্থ রুমালের প্রান্তে একটি টাকা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। গেরো খুলিয়া টাকা বাহির করিতেছি এমন সময় হাত ফস্‌কাইয়া টাকাটি শান বাঁধানো ফুট পাথের উপর পড়িয়া খানিকটা গড়াইয়া গেল। ছুটিয়া গিয়া সেটি কুড়াইয়া লইব অমনি অলক্ত-রঞ্জিত দুখানি পদ-পল্লব দৃষ্টি গোচর হইল। কি অনিন্দ্যসুন্দর সুগঠিত চরণযুগল! মুহূর্ত্তমাত্র দেখিয়াছিলাম—মুহূর্ত্তমাত্র। কিন্তু একটি নিমেষে সেই অপূর্ব্ব গঠন-সৌষ্ঠব, সেই নবনী-নিন্দিত কোমলতা—যাহা দৃষ্টিমাত্রেই অনুমিত হয় স্পর্শের অপেক্ষা রাখে না, সেই সুকুমার ঈষন্মাত্র কুঞ্চিত অলক্ত প্রসাধিত চম্পকাঙ্গুলি আমার মুগ্ধদৃষ্টিকে আবদ্ধ করিল। নিখুঁত পা দুখানি, নখাগ্র হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত সুন্দর। প্রত্যেক রেখাটি নিপুণ ভাস্কর-রচিত মর্ম্মর-খোদিত মসৃণোজ্জ্বল চরণ-পদ্মের লজ্জাস্থল। গৃহিণীর চরণারবিন্দের উদ্দেশে অনেকবার বলিয়াছি বটে—

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব-মুদারং";

কিন্তু সে কেবল অতিভক্তিমাত্র। ওই রাঙা পা দু'খানি দেখিয়া

বুঝিলাম অতিভক্তি ছাড়াও সত্য সত্যই চরণ-লালসা দুর্দ্দমনীয় হইতে পারে। পা দু'খানি দেখিতে দেখিতে মনে মনে একটা ত্রৈরাশিক অঙ্ক কষিয়া ফেলিলাম,—যথা, যার পায়ের শোভা এত, তার মুখের সৌন্দর্য্য কতখানি? অঙ্ক ফল যখন সম্মুখেই দণ্ডায়মান, তখন উত্তর মিলাইয়া লইতে বড় বিলম্ব হইল না। টাকাটি কুড়াইয়া লইয়াই পদযুগলের অধিকারিণীর মুখের দিকে তাকাইলাম। মুখখানি বড় মিষ্ট—নির্দ্দোষ বলিতে পারি না—কিন্তু লাবণ্যে ঢল ঢল। যুবতীর বা কিশোরীর বয়স ষোলোর উপর ত নয়ই, বরং দুই-এক বৎসর কমও হইতে পারে। মুখখানি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত, কপালে জরির টিপ্, সিঁথিতে অপর্য্যাপ্ত সিন্দুরের প্রলেপ। পরণে লাল সাড়ী, গায়ে সাদা ফুলদার ওড়্না। হাতে ও পায়ে রূপার গহনা—বেশভূষায় হিন্দুস্থানী বলিয়া বুঝিলাম। ঠিক তাহার পাশে তাহার হাত ধরিয়া একটি বৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছিল। সুগঠিত গৌরবর্ণ ক্ষীণ দেহ, গলায় উপবীত ও একখানি ময়লা উত্তরীয়। বৃদ্ধের মুখ বিষাদ ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে বার বার সম্মুখের রাস্তার দিকে চাহিতেছিল, পরক্ষণেই আবার "হো নারায়ণজি" বলিয়া হতাশ্বাসে ললাটে করাঘাত করিতেছিল। বড় কৌতূহল হইল, কপি কেনার কথা ভুলিয়া গিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যুবতী বৃদ্ধকে "বাবুজি" বলিয়া ডাকিয়া তাহার কানের কাছে মৃদুস্বরে কি বলিল। বৃদ্ধ যেন কতকটা অধৈর্য্যের সহিত তাহাকে নিবারণ করিয়া, পুনরায় ব্যাকুল নয়নে সম্মুখের রাস্তার দিকে তাকাইল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় কিছুক্ষণ দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল—যেন অসহ্য অধৈর্য্যের সহিত সে কাহারও প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ললাটে করাঘাত করিল। বুঝিলাম যুবতী এই বৃদ্ধের কন্যা। মেয়েটির মুখে একটি সলাজ অথচ নির্ভীক ভাবের বড় মধুর সমাবেশ ছিল। সে বোধ হয় বুঝিতে পারিল যে আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি।

একবার অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল। তারপর ঘোমটাটি ঈষৎ টানিয়া দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। তাহার মুখে উৎকণ্ঠার লেশমাত্র নাই বরং তাহার পিতার "হা হতোহস্মি" ভাবের তুলনায় তাহার স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে কেমন একটা অবহেলা ও দৃঢ়তা সূচিত হইতেছিল। কে তাহারা, কেন এইভাবে পথে দাঁড়াইয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে, জানিতে বড় কৌতূহল হইল। মেয়েটি আবার বৃদ্ধকে ডাকিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিল। তাহার গ্রীবা-ভঙ্গীতে বোধ হইল যে আর অপেক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। পিতা কন্যার অধৈর্য্য দমন করিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে নিতান্ত নিরুপায়ভাবে তাকাইতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। বৃদ্ধের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি এবং আমার দ্বারা তাহার কোনও সহায়তা হইতে পারে কি না। বৃদ্ধ ভগ্নস্বরে বাংলা হিন্দি মিশাইয়া বলিল যে তাহার একমাত্র এই কন্যাটিকে চারি বৎসর হইল বিবাহ দিয়াছিল। তাহার 'দামাদ্' ভবানীপুরে কাজ করে। সম্প্রতি সে বধূকে লইয়া ঘর করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বেচারী মুল্লুক হইতে আপনার অর্থব্যয় করিয়া কন্যাকে শিবপুরে নিজের বাসায় আনিয়াছিল। আজ সকালে জামাই তাহার গৃহে আসিয়া সমস্ত দিন যাপন করে ও নূতন গৃহস্থালী পাতিবে বলিয়া তাহার নিকট ৫০৲ টাকা কর্জ্জ লয়। সন্ধ্যার পর সে কন্যা ও জামাতাকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য শিবপুর হইতে হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত আসে। কথা ছিল জামাই বধূকে লইয়া ট্রামে ভবানীপুর চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই স্থানে সে তাহাদের দাঁড় করাইয়া মিষ্টান্ন আনিবার অছিলায় দু-ঘণ্টার উপর অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার হাতে কন্যার যথাসর্ব্বস্বের যে পুঁটুলিটি ছিল সেটিও লইয়া যাইতে ভুলে নাই। ইতিপূর্ব্বে সে জামাতার দুর্ণাম শুনিয়াছিল। আজিকার এই ঘটনা সকলি সপ্রমাণ করিল। তাহার মান ইজ্জৎ সবই ত গেল,—কন্যাকে লইয়া সে কোন্ মুখে আবার বাসায় ফিরিবে এবং

পাড়ার লোকদের কাছে কি করিয়া মুখ দেখাইবে! বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মেয়ে কি বলে?" সে বলিল, "হুজুর্, মেয়ে বলে আমাকে মুল্লুকে আমার মার কাছে পাঠাইয়া দাও, বোলো যে আমি বিধবা হইয়াছি, আমি আর ওই বেইমানের ঘর করিব না।" আমি একবার সেই মেয়েটির দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। সেই অকুণ্ঠিত দৃষ্টি আমার মুগ্ধদৃষ্টিকে প্রহত করিল। এবার আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম। হায়, এমন লাবণ্য-প্রতিমাকে প্রত্যাখ্যান করিল! এই নবযৌবনার অনাবিল যৌবন-শ্রীর এরূপ লাঞ্ছনা, তাহার সুপবিত্র নারীত্বের এরূপ অবমাননা আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার ক্ষুব্ধ আত্মমর্য্যাদার সুতীব্র প্রত্যাপেক্ষা, সেই অবহেলাহেলিত গর্ব্বোদ্ধত গ্রীবাভঙ্গী, সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর স্থির দৃষ্টি, সেই কঠোর অটল রমণীমূর্ত্তি সম্ভ্রমে ও সহানুভূতিতে আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিল। আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, "পথের ধারে আর অনর্থক অপেক্ষা করিয়া ফল কি? তাহার বাসা কতদূর?" বৃদ্ধ হতাশ্বাস ভাবে উত্তর করিল—প্রায় দুইক্রোশ হইবে। এই রাত্রে এই হতভাগিনী কন্যাকে লইয়া মন্থর চরণে বৃদ্ধ আপনার নিরানন্দ কুটীরে কি রূপে ফিরিয়া যাইবে ভাবিয়া চিত্ত বড়ই ব্যথিত হইল। কি আর করিব? হাতের টাকাটি বৃদ্ধের হাতে দিয়া বলিলাম, "একখানি গাড়িভাড়া করিয়া কন্যাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও। নারায়ণজি তোমাদের মঙ্গল করুন।" শেষবার কন্যাটির মুখের দিকে তাকাইলাম। এবার কেহই মুখ ফিরাইলাম না। অশ্রুজলে পূর্ণ দুটি স্বচ্ছ চক্ষুর করুণ দৃষ্টিতে সে নীরবে তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইল। সজল নেত্রে আমার মৌন সহানুভূতি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে জানাইলাম। তাহার পর ফিরিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলাম। কপিওয়ালি হাঁকিল—"কি বাবু, কপি নিলে না?" একটি পয়সাও আমার কাছে ছিল না—মৌনী রহিয়া তাহার বৌনির হাত এড়াইলাম। যথাসময়ে সভয়ে

গৃহে পৌঁছিলাম। গৃহিণী কপির ডাল্‌না রাঁধিবেন বলিয়া আলু কুটিয়া, মসলা বাটিয়া আমার পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। আমার খালি-হাত দেখিয়া তাঁহার ফুল্ল মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। "আজও কি ভুলিতে পারিলে?" "ভুলি নাই, তবে কারণ জিজ্ঞাসা কোরো না।" "আজ আবার এ কি ভঙ্গী!" আমি বলিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ রাত্রে কিছুই খাইব না।"

ঘরের প্রদীপটি নিভাইয়া দিয়া, অন্ধকার শয্যার উপর পড়িয়া, কতক্ষণ জানি না, সেই মুখ, সেই পা দু-খানি ভাবিতে ছিলাম। এমন সময় গৃহিণী আসিয়া ডাকিলেন, "মাথা খাও, ওঠ। ভাত বাড়া হইয়াছে।"

অবচনা

বহুবাজারে আমাদের 'মেস্' ছিল। পাশে গৃহস্থের বাড়ী। রমেশ ও আমি যে ঘরটিতে থাকিতাম তাহার জানালা খুলিলেই পাশের বাড়ীর অন্দরের উঠানটি চোখে পড়ে। পুরাণ একতালা বাড়ী, উঠানের পরে পুরাণ ঠাকুর দালান। সেখানে আর পূজা হয় না। থামগুলির বালি নোনা ধরিয়া ঝরিয়া গেছে। সমস্ত বাড়ীখানা যেন জরার প্রতিমূর্ত্তি। ঠাকুর দালানের উল্টা দিকে অর্থাৎ আমাদের মেসের দিকে, খোলার চালের রান্নাঘর। সকালে বিকালে তাহার ধোঁয়ার আনুকূল্য আমরা কিঞ্চিৎ পাইতাম। মাঝে মাঝে ইলিস্ মাছ্ ভাজার গন্ধ, ফুলকপি ভাজার গন্ধ, লঙ্কা সম্ভারের ঝাঁঝ্ এবং বিবিধ ব্যঞ্জনের লঘুতীব্র বিচিত্র সৌরভ আমাদের চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিত।

ঘোম্‌টা টানিয়া মেয়েরা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতেন। তা'ছাড়া চুল শুকাইতে এবং বড়ি ও আমসত্ত্ব দিবার জন্য শাশুড়ী, তাঁর বিধবা কন্যা ও পুত্রবধূ যখন ছাদে বসিতেন তখন আমাদের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিতাম। অন্দরের উঠানে কন্যা ও পুত্রবধূর ঘোম্‌টা বাহুল্য কমিয়া যাইত, সুতরাং তাঁদের মুখশ্রী আমাদের অগোচর ছিল না।

শাশুড়ী ও কন্যার গলার আওয়াজের সঙ্গে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, কিন্তু বধূটির কণ্ঠস্বর যে কিরূপ তাহার কোনও পরিচয় লাভ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। কিশোরীর পায়ে মল ছিল—কেবল চলিতে ফিরিতে তাহার ঝঙ্কারটি আমাদের কাণে রিনিঝিনি বাজিত।

সকাল নাই, দুপুর নাই, রাত্রি নাই, সময়ে, অসময়ে শাশুড়ী ও ননদে

মিলিয়া ওই চিরমৌনী বধূটিকে তিরস্কার করিতেন। সে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থাকিয়া থাকিয়া যুগপৎ বাজিয়া উঠিত। তবে কখনও আরম্ভে বা অন্তে কখনও এটির কখনও বা ওটির কলনিনাদ শ্রুতি গোচর হইত। কিন্তু একটি দিনও বধূকে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে শুনি নাই।

প্রথম প্রথম মনে করিতাম, বুঝিবা বউটি বোবা। কিন্তু একদিন রমেশ দুপুরবেলা সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া দেখে বউ আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে দিব্যি কথা বলিতেছে। আমি বিকাল বেলা ঘরের চৌকাট পার হইতে না হইতেই রমেশ বলিয়া উঠিল, "ওরে, বউ কথা কয়!" বেচারীর প্রতি আমাদের যে এতদিন সহানুভূতি ছিল তাহা প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য সংযম, কি অমানুষিক ধৈর্য্য!

সে দিন রবিবার। রবিবারে ও বাড়ীতে বেলায় রান্না চড়িত। বাবু স্বয়ং বাজারে বাহির হইতেন। তিনি ফিরিলে পর বোধ করি বাজারের গুরুত্ব অনুসারে রান্নার আয়োজন ভাল করিয়া হইত। ধোঁয়া বন্ধ করিবার জন্য আমরা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। রমেশ আমার তক্তাপোষে শুইয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" পড়িতেছে, আমি শুনিতেছি। এমন সময় হঠাৎ কাঁসর অর্থাৎ শাশুড়ী বাজিয়া উঠিলেন। তার অব্যবহিত পরেই ঘণ্টার কলনাদ রণিয়া উঠিল। বুঝিলাম, নিরামিষ বঁটিতে বধূ মাছ কুটিতেছেন এইটাই অদ্যকার কাংস্যনিক্কণের ধুয়া। স্বর লহরী মন্দীভূত হইয়া আবার দ্বিগুণ বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে। রমেশ হঠাৎ কাগজ ফেলিয়া দিয়া জানালার কাছে গিয়া খড়্‌খড়ি ঈষৎ খুলিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ওকি কর রমেশ, আর কেউ দেখ্‌তে পেলে বল্‌বে কি?" এই বলিয়া ঘরে খিল্‌ দিলাম। রমেশ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওরে, দেখবি যদি শিগগির্‌ আয়!" আমার কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল।

"কাজটা ভাল হচ্ছে না রমেশ,"—এই কথা বলিয়া রমেশের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া খড়্খড়িতে চোখ দিলাম।

দেখি ঠাকুর দালানে সিঁড়ির কাছে বসিয়া বউ মাছ কুটিতেছে এবং উঠানের অপর পার হইতে রান্না ঘরের রোয়াক্ আশ্রয় করিয়া মায়ে ঝিয়ে তাঁদের নিত্য নৈমিত্তিক রাসনিক কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতেছেন। তাঁদের দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু দেখিলাম বধূ একমনে নির্ব্বিকার চিত্তে মাছ কুটিতেছেন, মাথার কাপড় পড়িয়া গেছে। কেবল এক একবার ক্ষণেকের জন্য মাছকোটা মুল্‌তবি রাখিয়া পার্শ্বস্থিত একটি ছোট্ট ঝাঁটা তুলিয়া "White flag" এর মত শাশুড়ী ননদকে দিব্যি একটু ভঙ্গীর সঙ্গে দেখাইয়া, আবার পর মুহূর্ত্তেই নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে মাছ কুটিতে মনঃসংযোগ করিতেছেন। অমনি অপর পার হইতে সবেগে আবার আগ্নেয়-গিরির বহ্ন্যুদ্গার উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছে। বধূর মুখে রা'টি নাই, চোখে বিরক্তির লেশমাত্র নাই, কেবল ঝাঁটাটি দেখাইবার সময় একটা চাপাহাসি ও দন্ত ঘর্ষণের অপূর্ব্ব মিশ্রণে মুখে চোখে একটি অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি ক্ষণিকবিদ্যুৎ স্ফুরণবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ মাছের মুড়াটি কুটিবার সময় যে মৌন ভঙ্গিতে সে তার শাশুড়ী ও ননদের মুণ্ডপাতের অভিনয়টি করিল তাহা Cinema Starএরও অনুকরণাতীত, চাক্ষুষ দর্শন ভিন্ন কোন ইঙ্গিৎ উৎপ্রেক্ষায় বুঝাইবার উপায় নাই।

কোন্দলবিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব্ব, শব্দহীন, মর্ম্মভেদী, অগ্নিবাণটি বধূ কি করিয়া আবিষ্কার করিল এই প্রশ্নের মীমাংসায় যখন আমি কূটস্থ তখন রমেশ আমাকে ঝাঁকি মারিয়া বলিল, "যা বলিস ভাই, বউ কিন্তু আইন বাঁচিয়ে চলে, আজকালকার মেয়েদের মত গুরুজনের মুখে মুখে উত্তর দেয় না।"

এ পিঠ আর ও পিঠ

কালীঘাটের কালী-মন্দিরের কাছে এক গাছ তলায় এক সন্ন্যাসী বসিয়া—চারিদিকে লোকের ভিড়। আমি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম—ভিড়ের একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে, আমিও গিয়া ভিড়িলাম। গিয়া দেখি সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন যে, তাঁর দৈবশক্তিতে তিনি গাছটি মন্ত্রপূত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি গাছের নীচে একটি মাত্র পয়সা রাখিয়া গাছে চড়িবে, তাহারই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-দর্শন ঘটিবে। এ লোভ কি আর সামলান যায়! এত সস্তায় ব্রহ্ম-দর্শন ত প্রাচীন কালের ঋষি মুনিরাও দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে একজন নাকি বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম "করতলগত আমলকবৎ।" যে আমলকি ফলটি তিনি মুঠার ভিতর পাইয়াছিলেন তাহার দাম আধুনিক হিসাবে এক পয়সারও কম হইতে পারে বটে, কিন্তু সেটিকে সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে সংসার-ত্যাগী বনবাসী হইতে হইয়াছিল।

যাহা হোক্, গাছে যখন চড়িলাম তখন সন্ন্যাসী হাঁকিলেন, "দর্শন মিলা কি নেহি মিলা, সচ্ বোলো বাবা! আগর্ ঝুট্ বোলো গে কি—" বলিয়াই এমন একটি অশ্রাব্য গালাগালি দিলেন যে, সে ক্ষেত্রে দর্শন মিলিয়াছে বলাই একমাত্র আত্ম-রক্ষার পথ, নতুবা গালিটা গায়ে লাগে। অম্লান মুখে দর্শন লাভের কথা স্বীকার করিয়া গাছ ছাড়িয়া মাটিতে নামিলাম। ব্রহ্ম দর্শনের রহস্য প্রাণের গোপনে চিরসঞ্চিত হইয়া রহিল।

ইহার অল্পদিন পরেই একটি খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। মধুর ব্যবহারে একেবারে মনটি ছানিয়া লইলেন। তাঁর কাছে যাতায়াত করি এমন সময় একদিন তিনি বলিলেন "আজ তুমি আমার ভিতরের ঘরে চল, তোমাকে নিয়া একবার উপাসনায় বসিব।" তথাস্তু। তাঁহার সহিত তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ লাভ করিলাম। মূল্যবান্ আস্‌বাব্-পত্রে ও পুস্তকের আল্‌মারিগুলিতে ঘরখানি সুসজ্জিত। ম্যাটিংএর উপর একস্থানে একটি সুকোমল গালিচা পাতা। তিনি হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, আমি পদ্মাসনে বসিলাম। অতঃপর যীশুখৃষ্টের নিকট একটি সঙ্ক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়াই আমাকে নিতান্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল বন্ধু, তাঁর স্পর্শ বুকে অনুভব করলে কি? ঠিক সত্য বল, লজ্জা কোরো না!" সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা মনে পড়িল। অতি কষ্টে হাসির আবেগ সম্বরণ করিলাম। সে-বার গালাগালি খাইবার ভয়ে মিথ্যা বলিয়াছিলাম, এবার কিন্তু সভয়ে সত্য কথাই বলিয়া ফেলিলাম। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা! নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে স্পর্শ করেছেন, আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, দেখ দেখি ভাল করে স্মরণ করে।" আমি একটু থতমত খাইয়া ঢোক্ গিলিয়া বলিলাম, "কই ঠিক্ ত স্মরণ হচ্ছে না!" তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তবেই ত, মনে হচ্ছে না যখন বল্‌ছ তখন স্পর্শ করেন নি এ কথা ত বল্‌তেই পার না—দেখ, ভাল করে প্রাণের ভিতর তলিয়ে দেখ, তাঁর স্পর্শের অনুভূতিটি পাও কি না।" প্রাণের মধ্যে ডুব দিয়া যখন আর তল খুঁজিয়া পাই না, এদিকে দম বন্ধ হইয়া আসে, তখন সে অতল-স্পর্শ হইতে হাঁপাইয়া উঠিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, আজ আমাকে ছেড়ে দিন্। যদি সদুত্তর পাই ত আপনাকে জানাব।" তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

আমার স্বদেশী সেই সন্ন্যাসী এবং প্রবাসী এই পাদ্রি সাহেবটি যে

আধ্যাত্মিক যমজ ভ্রাতা, সে বিষয়ে আমার মনে কিন্তু কোনও সংশয় নাই। তবে একজন দরিদ্র, আমার পয়সা নিয়া আমাকে গালাগালির ভয় দেখাইয়াছিল। আর একজন লক্ষ্মীমন্ত, নিজেদের খরচায় আমাকে আশ্বাস দান করিয়াছিলেন।

কাবুলি-বিড়াল

প্রতিভা যখন বেথুন স্কুলের থার্ড্ ক্লাশে পড়ে তখন ম্যাট্রিকিউলেশন্ ক্লাশের একটি মেয়ে তাকে একটা কাবুলিবিড়ালের ছানা উপহার দেয়। যখন সে নিজে ম্যাট্রিকিউলেশন্ ক্লাশে উঠল তখন তার বিয়ে। এই তিন বৎসর সে বিড়ালটিকে মাতৃস্নেহে পালন করেছে।

সে বিড়ালটি কিন্তু আমাদের গৃহস্থ ঘরের মেনি বিড়ালের মত দুধ ভাত খায় না। প্রতিভা তাকে রোজ এ-বেলা ও-বেলা ঘি দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াত। রাংতামোড়া চকোলেট্‌গুলি খুলে খুলে তার মুখের কাছে ধরত। তার জিভের ডগাটি প্রতিভার আঙুলগুলির মাথার উপর গোলাপি রংএ ভেজা তুলির মত যখন বুলাত তখন মনে হ'ত যেন প্রতিভার কোমল আঙুলের মুখগুলি তার জিভের রংএ রাঙা হয়ে উঠেছে।

প্রাইজে পাওয়া, বাপের দেওয়া, প্রতি জন্মদিনে বন্ধুদের উপহারের দান তার চকচকে বইগুলির সঙ্গে কাবুলি-বিড়ালটিও প্রতিভার সঙ্গ নিয়ে তার নূতন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে উঠল। এই বইগুলি তার বড় যত্নের বড় আদরের ধন। তাদের গল্পগুলি, কবিতাগুলি প্রতিভার প্রাণটাকে যেন ভরে রেখেছিল। তারা যেন ওই কাবুলিবিড়ালের ছানার মত, প্রতিভা তাদের নানা স্বপ্ন নানা কল্পনা দিয়ে এতদিন মানুষ করে এসেছে।

শ্বশুরবাড়ি এসে এই কাবুলিবিড়ালের দল বড় বিপদে পড়ল। যেটি সত্যিকার বিড়াল, উপমার নয়, তার ভাতের সঙ্গে ঘিয়ের বদলে দুধের ব্যবস্থা হ'ল। আর সেই রাংতা-মোড়া চকোলেট্‌গুলি যেন

অন্ধকার রাতে ওই সুদূর আকাশের তারা হয়ে ঝক্‌ঝক্‌ করত। বিড়ালটি ঊর্দ্ধমুখী হয়ে আকাশ পানে চেয়ে থাকৃত, তার চোখের জলে তারার আলো ঝিক্‌মিক করত।

এমন যে তার নাদুস্‌নুদুস্‌ শরীর, ক্রমে তা শুকিয়ে এল, গায়ের সেই মসৃণ চিক্কণ লোমগুলি ঝরতে আরম্ভ করল। বেচারীর মুখে দুধভাত রুচ্‌ত না। ক্ষিধের জ্বালায় বাটির কাছে মুখ নিয়ে যেত, দু'একবার জিভও ঠেকাত। তারপর বাটির দুধ বাটিতেই পড়ে থাকৃত, পেটের ক্ষিধে পেটে নিয়ে বারাণ্ডার কোণে এসে চুপটি করে সে বসে পড়ত। বাড়ীর কেউ তার দুঃখ দেখত না, বুঝত না। কেবল প্রতিভার প্রাণ সারাদিন তার জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল হত। সে কান্না তো বাইরে কাঁদ্‌বার জো নেই। কেউ তা দেখত না, বুঝত না।

হঠাৎ একদিন প্রতিভার এক ফন্দি মনে এল। গরজ বড় বালাই, অভাব যখন জাগে ফিকির্‌ তখন আপনি এসে হাজির হয়। সে সেদিন তার আঙ্গুলে একটু ঘি নিয়ে বিড়ালের গোঁফে ঘসে দিল তারপর দুধের বাটিটি তার মুখের সাম্‌নে ধরল। বিড়ালটি দৌড়ে এসে বাটিতে মুখ দিল। তার চোখে ক্ষিধের আগুন জ্বল্‌ছে। রাঙ্গা জিভটি দিয়ে দু'একবার এদিক ওদিক চেটে বাটি থেকে মুখ তুলে নিল। তারপর, প্রতিভা দেখল বিড়াল একটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে, চোখ বুজে আবার দুধের বাটিতে মুখ দিল। বোধ হয় ঘিয়ের গন্ধটা ভাল করে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, প্রত্যক্ষটাকে চোখ বুজে এড়িয়ে কোনও মতে পেটের ক্ষুধা সে মিটিয়ে নেবে।

প্রতিভা যেন অকূলে কূল পেল। ঐ ঘিয়ের গন্ধটুকুর কি এত শক্তি! তার সাধের বিড়ালটি আবার একটু একটু করে তাজা হয়ে উঠতে লাগল। তারপর ক্রমে এমন দিন এল যখন আর তার গোঁফে ঘি ঘস্‌বার দরকার হ'ত না। অন্য বিড়ালের মত সেও এখন বিনা

আপত্তিতে দুধ ভাত খায়। পাতের ফেলা মাছের কাঁটাটি পর্য্যন্ত বাদ যায় না। আকাশের তারায় আর সে রাংতা-মোড়া চকোলেট্ দেখে কিনা তা তো আমি জানি নে। বিড়ালের মন, বিশেষতঃ কাবুলিবিড়ালের মন বুঝব কেমন করে?

কিন্তু একটা ব্যাপার আমার বড় আশ্চর্য্য লাগে। বিড়ালটির চেহারা এখন ঠিক আমাদের মেনিবিড়ালের মত হয়ে গেছে। 'এই বিড়াল বনে গিয়ে বন-বিড়াল হয়' এ কথা শোনা ছিল। কিন্তু কাবুলি-বিড়াল আমাদের ঘরে এসে যে মেনি বিড়াল হয়ে যেতে পারে তা নিজের চোখে দেখলাম। আমি বিড়ালটিকে প্রতিভার বাড়ী ও শ্বশুর বাড়ী দু জায়গায়ই দেখেছি। আমি তার স্বামী।

প্রতিভার বই গুলিরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। কেতাবেরও বয়স বাড়ে পাঠকের বয়সের সঙ্গে। তাদের ছাপার হরপে পাঠকের অনুভূতি অভিজ্ঞতার আমেজ লাগে। কেন জানি নে, আমার মনে হয় তার বইগুলি পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী এসে বদ্‌লে গেছে। ওই কাবুলি-বিড়ালের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যটা এখনও নষ্ট হয়নি। তারাও সব মেনি বিড়াল হয়ে উঠেছে।

রঘুবীর

বাল্যস্মৃতি যতদূর পৌঁছায় ততদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধ রঘুবীরকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমার স্মৃতির দিক্‌চক্রবালে সে যেন একটা পাহাড়ের মত আপনার সুস্পষ্ট রেখাটি আকাশের গায়ে আঁকিয়া দিয়াছে। তখন আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই—লক্ষ্মী তখনও আমাদের গৃহাঙ্গন ত্যাগ করেন নাই। বাড়ীতে অনেক দাস দাসী ছিল। এখন কেবল তাদের জনতার কথাই মনে পড়ে কিন্তু কাহাকেই স্মরণ নাই। কেবল মনে পড়ে বুড়া রঘুবীরকে।

ফটকের পাশেই তার ঘর ছিল। ছোট ঘর, সেই ঘরের এক কোণে সে রাঁধিত, আর এক কোণে খাটিয়া পাতিয়া শুইত। খাটিয়ার পাশের দেয়ালে একটি ছোট জানালা। জানালায় আর কড়িকাঠগুলিতে ঝুলের ঝালর ঝুলিত, আর ঘরে ভিতরকার স্তব্ধ অন্ধকারটি যেন দেওয়ালগুলির গায়ে কালির পলি রাখিয়া একটা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। উনানের পাশে মস্ত পাথরের শিলনোড়া এবং দুই খানি ইঁটের উপর পাতা একটি কাঠের তাকে ঝক্‌ঝকে মাজা থালা বাটি আর লোটা; কাঠের সিন্ধুকের উপর ঢাকনা-ভাঙ্গা আর্‌সির কোণে কাঠের কাঁকই গোঁজা; দেয়ালের গায়ে সীতারামের ছবি এবং ঠিক তার পাশেই গেলাপে-ঢাকা সেতারটি বাদুড়ের মত পাখা গুটাইয়া ঝুলিতেছে; সবই যেন আজিও স্পষ্ট চোখের সাম্‌নে দেখিতেছি। তার খড়ম নাগরা জুতা, পিতলে বাঁধান লাঠি, এক জোড়া ভারী মুগুর, মস্তবড় পাগ্‌ড়ি, কিছুই ভুলিতে পারি নাই।

যখন তখন তাহার কাছে ছুটিয়া যাইতাম; সে আমার সকল আবদার উপদ্রব অকাতরে সহ্য করিত। কাহারও সঙ্গে রঘুবীর বড় একটা কথা বলিত না। নিজের মনে থাকিত, মাঝে মাঝে বিড়্ বিড়্ করিয়া আপনা আপনি বকিত অথবা কী মন্ত্র আওড়াইত। আমি কাণ পাতিয়া শুনিতেছি দেখিলেই হাসিয়া থামিয়া যাইত। তার হাসিটি বড় মিষ্ট লাগিত কিন্তু তদপেক্ষাও ভাল লাগিত যখন সে কাহাকেও ধমক দিত। তার রক্ত চক্ষু, ভ্রূকুটি ভঙ্গী, তার শার্ঙ্গরব আমাকে মুগ্ধ করিত। মনে পড়ে কত সময় আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আমার শিশুসুলভ মসৃণ কপালের চর্ম্মটি কুঞ্চিত করিয়া টিপিয়া ধরিয়া, তার ত্রিশিরা ভ্রূকুটির অনুকরণ করিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতাম। তাকে নকল করিয়া ঝি-চাকরদের ধম্‌কাইতে গিয়া কত সময়ে মার কাছে শাস্তি পাইতাম।

রঘুবীরের জীবনটি দম্ দেওয়া ঘড়ির মত ঠিক নিয়মিত চলিত। এক চুল ব্যতিক্রম কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। সে ভোরে ডন-বৈঠক ও মুগুর ভাঁজা শেষ করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে বাড়ী ফিরিত। দুপুরে দাড়ি পাকাইয়া কানের উপর দিয়া গলাইয়া, এক টুকরা কাপড়ে আঁটিয়া বাঁধিয়া ঘুমাইত। রাত্রে স্বর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ শেষ হইলে সেতার লইয়া বসিত। কত রাত্রে যে শুইত তাহা কেহই বলিতে পারে না। চাকররা বলাবলি করিত সে সারারাত ধরিয়া নাকি রাগরাগিণীর আলাপ করে।

আমাদের স্কুলে লইয়া যাওয়া ও ফিরাইয়া আনার ভার ছিল তার উপর। যে দিন কোন কারণে ঘরের গাড়ী আমাদের আনিতে না যাইত সেদিন তার সঙ্গে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতাম। আমি বড় একটা হাঁটিতাম না, তার কাঁধে চড়িয়া ফিরিতাম, আর কাহাকেও সে কাঁধে লইত না।

বাড়ীর সকলেই তাহাকে বেশ ভয় করিত। বাবার ধমক-ধামক

নির্ব্বিশেষে সকলকেই খাইতে হইত, মা পর্য্যন্ত বাদ পড়িতেন না। কিন্তু রঘুবীরকে কখনও বকিতে শুনি নাই। কেবল একদিনকার ঘটনা কখনও ভুলিব না। রঘুবীরের উপর ভার ছিল যে সে গোয়ালার বাড়ী হইতে দুধ দোহাইয়া আনিবে। খাঁটি দুধের সম্বন্ধে বাবার অতিভক্তি ছিল। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় দুধের বাটি মুখে তুলিয়াই নামাইয়া রাখিলেন। দুধে জল কেন কৈফিয়ৎ চাহিলে মা বলিলেন যে রঘুবীর নিজে গিয়া দুধ দোহাইয়া আনে এবং তিনি স্বহস্তে জাল দিয়া কড়া সমেত দুধ ভাঁড়ারে বন্ধ করিয়া রাখেন, সুতরাং জল মিশাইবার কাহারও কোথাও ফাঁক্ নাই। যে কারণেই হোক্ বাবার মেজাজটা সেদিন কিঞ্চিৎ কবোষ্ণ ছিল। তিনি রঘুবীরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তখন আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি, আমি খাবার ঘরেই বসিয়াছিলাম, বাবার পাতের আম-সন্দেশের প্রসাদের প্রত্যাশায়। রঘুবীর আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বাবা হাঁকিলেন "দুধমে এ্যায়সা পাণি হোতা কাহে ?" রঘুবীর গম্ভীর ভাবে জানাইল যে সে নিজে প্রতিদিন গোয়ালার কেঁড়ে পরীক্ষা করিয়া সাম্‌নে বসিয়া দুধ দোহাইয়া থাকে। সুতরাং দুধে জল কেন তাহার হিসাব সে দিতে অসমর্থ। তার উত্তরের মধ্যে এমন একটা ঔদ্ধত্য প্রচ্ছন্ন ছিল যাহা বাবাকে বিদ্ধ করিল। বাবা হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন তার এক মাসের তলব জরিমানা করা হইল। বাবা হাকিমি করিতেন। "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া রঘুবীর আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া খড়মের খট্ খট্ আওয়াজে বারাণ্ডা মুখরিত করিয়া নীচে নামিয়া গেল। মা অপ্রসন্ন মুখে বাবাকে ভর্ৎসনা করিলেন "মিছামিছি উহাকে বকিলে কেন ? জান ত ও কত বিশ্বাসী লোক।" রঘুবীরের স্পর্দ্ধিত উত্তরে বাবা আগুন হইয়া আছেন এমন সময়ে আবার খড়মের খটাখট শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। রঘুবীর খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চারখানা নোট গুণিয়া ভাঁজ করিয়া বাবার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বলিল "লেও বাবু

আপকা দুধকা দাম, মেরা পাণিকা দাম ঘুমায় দেও।" বাবা তখনি এক-লম্ফ দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িবেন এমন সময় মা উঠিয়া রঘুবীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বলিলেন "তোমার কোনও দোষ নাই, তোমার ঘরে যাও বাবা।" রঘুবীর মাকে প্রণাম করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল "আমাকে বিদায় দিন্ মাঠাকরুণ, আমার প্রতি অবিশ্বাস যেখানে সেখানে নিমক গ্রহণ করিব এমন বেইমান আমি নই"। রঘুবীর-নীচে চলিয়া গেলে মা আর বাবার বাক্‌যুদ্ধ হইল। দেখিলাম মা অবলীলাক্রমে বাবাকে পরাস্ত করিলেন। রঘুবীরের জয় হইল, "জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

তাহার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যু হইয়াছে। দাদা মফঃস্বলে ওকালতি করেন, মাঝে মাঝে বাড়ী আসেন। আমি কলেজে পড়ি, মাকে লইয়া কলিকাতায় থাকি। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আগেকার দাসদাসীর বাহুল্য আর নাই। কিন্তু রঘুবীর আছে। সে আরও বুড়া হইয়াছে। তার মুগুর এখন আমি ঘুরাই, কিন্তু এখনও তাহার সঙ্গে পাঞ্জা কষিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারি না। তার আঙ্গুলগুলা লোহার যাঁতা কলের মত আমার হাত পিষিয়া দেয়। সে এখন আমার ওস্তাদজি, সন্ধ্যার পর তার কাছে সেতার শিখি।

বাবার একখানা পাল্কী গাড়ী ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সেখানা বেচিয়া ফেলার কথা হইল। একজন খরিদ্দার ঘোড়ার চাল দেখিবার জন্য আমাদের গাড়ী লইয়া বাহির হইলেন। ভদ্রলোকটি দালালি করেন। ভোরে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, বেলা প্রায় দুটার সময় সমস্ত সহর ঘুরিয়া আমাদের আস্তাবলে ফিরিলেন। রঘুবীর কোচবাক্সে কোচমানের পাশে তার সেই মামুলিধরণের পাগড়ী বাঁধিয়া পিতলবাঁধান লাঠিটি লইয়া বসিয়াছিল। দাদা গাড়ীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রঘুবীর কোচবাক্সের উপর হইতে হাঁকিল,"হুজুর, ইয়ে

জহ্লাদকো ঘোড়া নেহি বেচনা।” দাদা অপ্রস্তুত, সে ভদ্রলোক ত অগ্নিশর্ম্মা! রঘু তড়াক করিয়া কোচবাক্স হইতে লাফাইয়া নামিয়া বলিল “ইয়ে ঘোড়া আউর গাড়ী হাম লেয়গা, বাবু যো দাম দেনে মাঙ্‌তা উস্‌সে ভি আউর পঁচাশ রুপেয়া যাস্তি দেয়গা।”

খরিদ্দার ত বিদায় হইলেন। দাদা গরম হয়ে রঘুকে বলিলেন “এ কি রকম ব্যবহার তোমার রঘুবীর। পুরাণ লোক হয়েছ বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছ?” রঘুবীর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিল “কর্ত্তার অমন যত্নের ঘোড়ার কেউ অযত্ন কর্‌বে তা আমি প্রাণ থাক্‌তে দেখতে পার্‌ব না। আমরা দুজনেই এক মনিবের চাকর, আমি যেমন আপনাদের ভিটায় আছি সেও তেমনি থাকবে।” দাদা বল্লেন “আরে পাগল, ওকে খাওয়াবে কে? আর আমাদের গাড়ীর বা এখন দরকার কি? তুই ত জানিস্ আর সে দিন এখন আমাদের নাই।” রঘু বলিল “আমার এক মৎলব আছে আপনাকে বলি শুনুন।” দাদা অসহিষ্ণু হইয়া তার কথায় কান না দেওয়াতে সে বলিল—“তোমার বিরক্তির ত, কোন কারণ নাই, বড় দাদাবাবু। আমি কথা দিয়েছি ও গাড়ী ঘোড়া আমি কিনব, তোমার ত টাকা পেলেই হল?” দাদা বল্লেন “গাড়ীঘোড়া নিয়ে তুমি কি কর্‌বে বাপু, শুনি?” রঘুবীর উত্তর করিল “গাড়ী ফেঁড়ে চেলাকাঠ করে উনানে পোড়াব যতদিন না তোমার টাকা শোধ দিতে পারি। তারপর ওই ঘোড়া চেপে মুল্লুকে চলে যাব।” দাদা এই উত্তর শুনে চটে গেলেন দেখে আমি এগিয়ে এসে বল্লাম “কি রঘু, তোমার মৎলবটা কি আমাকে বল ত।” সে আমার স্নেহ সম্ভাষণ শুনে আত্মসম্বরণ করে বল্‌ল, “ছোট বাবু, কর্ত্তার গাড়ীঘোড়া বেচ্‌বার কোনও দরকার নেই। পাড়ার ক’জন নূতন উকীল বাবুরা আমাকে বলেছেন যে তাঁদের ছোট আদালতে সোয়ারি দেবার জন্য আমাদের ঘরের গাড়ী তাঁরা মাসিক হিসাবে ভাড়া নিতে প্রস্তুত। গাড়ী চালাবার ভার আমার উপর দিন

গাড়ী আপনাদের রইল।” বলা বাহুল্য, ফন্দিটা আমার মনঃপুত না হইলেও দাদার আইন-মার্জ্জিত বিবেকের অনুমোদিত হ’ল। রঘুবীর মিউনিসিপালিটির চোখে ধূলো দিয়ে তার মনিবের মান ইজ্জৎ লোকের চক্ষে রক্ষা করিল।

একদিন দেখি সন্ধ্যার পর বুড়া আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে আর সেতারে নূতন তার চড়াইতেছে। আমি তখনি বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছি। গানের সুরটি কানে বড় মিঠা লাগিল। বল্লাম “কি গান হচ্ছে ওস্তাদজি”। তার কাছে সেতার শেখা আরম্ভ করে অবধি তাকে বড় একটা নাম ধরে ডাকতাম না। সে হেসে বল্‌ল “প্রেমসঙ্গীত, শুন্‌বে বাবুজি?” সে সেতার বাজাইয়া ঘাড় দুলাইয়া গাহিল:—

“সোণা লাওন্‌ পিউ গেয়ে,
  শূন্‌ কর্‌ গেয়ে দেশ;
সোণা আওয়ে না পিউ আওয়ে,
  রূপা ভে গেয়ে কেশ।
রূপা ভে গেয়ে কেশ লাওন্‌
  রূপা সব্‌ গোয়ানা;
বহুরি কান্ত্‌ ঘর আওয়ে,
  ক্যায়া করে লে কে সোণা?”

সুদূর প্রবাসে স্বামী অর্থাগমের চেষ্টায় গিয়াছে, আর ফিরে নাই। যুবতী স্ত্রী চিরপ্রতীক্ষায় তার পথ চেয়ে রয়েছে—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যে চলে যায়, যৌবনের জোয়ার যে জরার ভাঁটায় মন্দীভূত হয়ে এল, তবু বঁধু যে আর ঘরে ফেরে না! হায়, সোণার সন্ধানে গেলে, এদিকে আমার মাথার কেশ যে রূপা হয়ে গেল! ফিরে

এস, ফিরে এস, বঁধুগো ফিরে এস। কি হবে আমার সোণা দানায়! যৌবনের স্বর্ণ-দীপ যে তৈল হীন ; হেম-শিখা যে নিভ নিভ।

আমরা বাঙ্গালী। চিরদিন গৃহ কোণে বাঁধা। আমাদের মত গৃহ মার্জ্জার কুত্রাপি নাই। প্রোষিতভর্ত্তৃকার দুঃখ আমরা বুঝিব কি? এই বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যে প্রবাসী ভৃত্যেরা নিত্য আমাদের সেবা করে, পশ্চিমের কোন্ সুদূর পল্লীতে তাদের গৃহ-লক্ষ্মীরা কি ভাবে দিন কাটায় তা কি আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি? হঠাৎ মনে হইল কত-কাল কত বৎসর রঘুবীর দেশত্যাগী হইয়া আমাদের গৃহে আশ্রয় নিয়াছে। কই, সে কখনও ত মুল্লুকে ফিরিয়া যায় নাই। অথচ প্রতি মাসেই ত দেশে টাকা পাঠাইত। কতদিন আমার কাছে মণিঅর্ডারের ফর্ম্ লিখাইয়া লইয়া গিয়াছে। রঘুবীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওস্তাদ্‌জি, দেশে তোমার কে আছে?" প্রশ্ন শুনে সে বুঝিল তার গানেব কথাগুলিতে আমার মনে কৌতূহল জাগিয়াছে। একটু চোখ বুঁজিয়া তারপর আমার মুখের উপর গম্ভীর দৃষ্টি রাখিয়া বলিল "বাবুজি, আমার সব ছিল, কিন্তু আমার কিছুই নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি মুল্লুক ছেড়ে কেন কল্‌কাতায় এসেছিলে? তোমার কি তখন কেউ আপনার বল্‌তে ছিল না?"

সে বল্‌ল "শুন্‌বে বাবুজি আমার জীবনের ইতিহাস? শোন! আমার বাড়ী লক্ষ্ণৌ জিলায়। মোগল বাদ্‌শাহদের সময় থেকে পুরুষা-নুক্রমে আমরা ফৌজদের পাগ্‌ড়ি তৈয়ারী করতাম। তাতে জরির কাজ করা থাকৃত। এই ব্যবসায়ে আমাদের যথেষ্ট আয় ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার স্থানীয় রাজাদের সিপাহী বরকন্দাজ রাখা বন্ধ করে দিলেন। সেই সঙ্গে আমার ব্যবসাও নষ্ট হয়ে গেল। দেনা হওয়ায় আমার স্ত্রীর কাছে তার অলঙ্কারগুলি চাইলাম, বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ কর্‌ব বলে। তাকে আমি অনেক গহনা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হ'ল না। পৈত্রিক

জমাজমি কিছু ছিল, তাই বেচে ঋণ শোধ করলাম। আমার একটি ছেলে ছিল, এক বছরের। তার মুখ চেয়েই জমি বিক্রয় করতে মন সরে নি। প্রথমে স্ত্রীর উপর রাগ হয়েছিল। তারপর ভেবে দেখলাম যে রাগ অন্যায়, তাকে যা দিয়েছি তার উপর ত আমার দাবী নেই। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যদি দিত সে আলাদা কথা। কিন্তু তার জিনিষ আমাকে দিল না বলে আমি রাগ করি কেন? আমার উপর বড় ধিক্কার হ'ল। ভাব্‌লাম, যদি কখনও অবস্থার উন্নতি করতে পারি তবেই দেশে ফিরব, নতুবা স্ত্রীর কাছে ভিক্ষা করে যে পুরুষ প্রত্যাখ্যান লাভ করেছে, স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার সে উপযুক্ত নয়। সেই আমি দেশত্যাগী হই। বিদায়ের সময় স্ত্রীকে বলেছিলাম "যদি আবার তোমাকে গহনা দিবার সামর্থ্য আমার কখনও হয় তবেই আমি ঘরে ফিরব, নতুবা আর ফিরব না।" আমি কলকাতায় হেঁটে আসি। বড়বাজারে একজন পূর্ব্বপরিচিত ব্যবসাদারের বাড়ী এসে উঠি। তারপরেই আমার খুব ব্যারাম হয়। বাঁচবার কোন আশা ছিল না। যে ডাক্তার বাবুর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করি তিনিই আমাকে তোমাদের বাড়ীতে চাকুরী জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর? তারপর আর কি বলব? তোমাদের বাড়ীতে দুবৎসর চাকুরী করার পর আমার ছেলেটি মারা যায়। সে সংবাদ আমাকে তখন কেহই দেয় নি। আমি নিয়মিত আমার পরিবারের জন্য টাকা পাঠাতাম। তারপর যখন শুনলাম আমার স্ত্রী কুলত্যাগিনী হয়েছে তখন এও শুনলাম যে ইতিপূর্ব্বে আমার পুত্রবিয়োগও ঘটেছে। নারায়ণজি আমার কুলপ্রদীপটি নিভিয়ে আমাদের অকলঙ্ক কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। স্ত্রীর উপর আমি রাগ করি না। সে পতিপুত্রহীন হয়ে একেবারে বন্ধন-হারা হয়ে পড়েছিল। তাকে রক্ষা করবার জন্য আমি কাছে ছিলাম না। সে ধর্ম্মরক্ষা, আত্মরক্ষা করতে পারে নি। দুর্ব্বলের উপর রাগ

করে কি হবে? তার বিচার ভগবান্ করবেন। আমি কাছে থাকলে হয় ত তার এ দুর্দ্দশা ঘটত না। এক একবার মনে হয় দেশে গিয়ে মরবার আগে তাকে একবার যদি দেখতে পেতাম! আমাকে চিনতে পারবে কি? সে আমার সুখের দিনের সঙ্গিনী ছিল। লক্ষ্মী চঞ্চলা সে তাঁরই সহচরী—লক্ষ্মী যখন চলে গেলেন তখন তাকে ধরে রাখব কেমন করে?"

রঘুবীর অল্পদিন পরেই আমাদের বাড়ীতে মারা গেল। মরিবার আগে আমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবুজি, আমার দিন ফুরিয়েছে। আমার বাক্সে যে টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে অলঙ্কার গড়িয়ে তাকে পাঠিয়ে দিও, এই আমার শেষ অনুরোধ। টাকার মোড়কের ভিতর তার ঠিকানা লেখা আছে।"

———

বেহালা

(১)

কালিদাস এসে একদিন আমাকে ধর্‌ল—"মামা তুমিত বেহালা বাজাও না—জোড়্ তোড়্ খুলে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে সেটা বাক্সে বন্ধ আছে। ওটা আমাকে দাও না। দেখি, যদি মেরামত করে বাজাবার মত করে নিতে পারি।"

আমি সত্বাধিকারটা একেবারে ত্যাগ না করে বল্লাম "বেশত, ওটাকে জোড়া তাড়া দিয়ে যদি বাজাবার মত করে নিতে পারিস্ ত ভালই। আমার বেহালা তোরা বাজাবি না ত বাজাবে কে?" বেহালার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আট বৎসর আগে নতুন সখের মাথায় বেহালা কিনেছিলাম। কিছুদিন ধরে সেটা নিয়ে একটু নাড়া চাড়াও করেছিলাম বটে। তারপর সব সখই যেমন মেটে আমার বেহালার সখও তেমনি মিটে গিয়েছিল। আর পাঁচটা বেকার যন্ত্রের সঙ্গে সেটাও ছিল। বন্ধু বান্ধবেরা মাঝে মাঝে এসে হারমোনিয়ামটা নিয়ে গান জুড়ে দিত আমি বাঁয়া তব্‌লায় ঠেকা দিতাম। তাদের মধ্যে কারুরই বেহালায় হাত চল্‌ত না সুতরাং বেহালাখানি বাক্সবন্ধীই ছিল, তার দিকে আর কেউ ঘেঁস্‌ত না। আমার বৈঠকে যখন গান বাজ্‌নার তরঙ্গ উঠত তখন সেই স্বরলহরী বোধ হয় তার শূন্য খোল্‌টার ভিতর একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনিতে গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদত, তার তারগুলিতে হয়ত একটা মৃদু কম্পন থেকে থেকে জেগে উঠত। তারপর কবে একটি একটি করে তার তারগুলি ছিঁড়ে গেল এবং তার জোড়ে জোড়ে শিরিষের আঠার বন্ধন শিথিল হয়ে তাকে শতধা করে দিয়েছিল, আমি

সে সংবাদ রাখি নাই। ঠিক এমনি করেই বোধ হয় কবরের 'কফিনের' ভিতর শব কঙ্কালের গ্রন্থিগুলি খসে খসে পড়ে।

(২)

কালিদাস আমার ভাগ্নে মহেন্দ্রের সহপাঠী। আমার ভগ্নিপতির মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আমার দিদিও মারা গেলেন। আমি পিতৃ-মাতৃহীন মহেন্দ্রকে আমাব বাড়ীতে নিয়ে এলাম। এই ঘটনার অল্পদিন পূর্ব্বেই আমি আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রমীলাকে ঘরে এনেছি। প্রমীলার বয়স তখন বার কি তের। সে মহেন্দ্রের সমবয়সী। আমার যে সময়ে গান বাজনার সখ নূতন করে জেগেছিল, বেহালাটি কিনি সেই সময়ে। আমি আসলে গাইয়ে বাজিয়ে লোক নই। যে সাধনা ও একাগ্রতা থাকলে সঙ্গীত লক্ষ্মী ভক্তের কাছে ধরা দেন, আমার তা ছিল না। তবে গান বাজনা শুনতে ভালবাসতাম, নিজেও যে একটু আধটু টুম্‌টাম্ না করতাম তা নয়। কেবল উপর উপর চাখা মাত্র, কতকটা যেন আপনাকে ধরা না দিয়ে বিয়ের কনে দেখে বেড়ানর মত। কালিদাস আমার এক প্রতিবেশীর ছেলে। তাঁর ঘটকালীতেই এক রকম প্রমীলার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। মহেন্দ্রের সঙ্গে কালিদাসের দুদিনেই খুব ভাব হয়ে গেল। দুজনে এক স্কুলে এক ক্লাশেই পড়ত। অনেক সময়েই সে মহেন্দ্রের সঙ্গে ছুটির পর স্কুল থেকে আমার বাড়ী আসত, তার সঙ্গে জলখাবার খেয়ে খেলা ধূলা পড়াশুনা ইত্যাদিতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাত। সেই সময়ে আমি পাড়ার ছেলদের নিয়ে এক অভিনয় করি। কালিদাস সেই সখের দলে মেয়ে সাজত। অতি মিষ্টি গলা। ঠিক যেন মেয়েরই মত। তার কল্যাণে আমাদের অভিনয় সেবার খুব জমেছিল। ক্রমে সে এক রকম বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেল। মহেন্দ্রর সম্পর্কে আমাকে 'মামা' আর প্রমীলাকে মামীমা বলে ডাকত।

প্রমীলাও তাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। অমন মিষ্টি গলা যার, কে না তাকে ভালবাসে ?

স্কুল কলেজের ছুটি আফিসের ছুটির চেয়ে অনেক বেশী। ছুটির দিন কালিদাস সমস্ত ক্ষণই আমাদের বাড়ী কাটাত। খেয়ে দেয়ে রাত্রে বাড়ী ফিরত। প্রমীলার প্রকৃতিটি ঠিক আমার মনের মত। সে গান বাজনা শুনতে খুবই ভাল বাসত, আমোদ আহ্লাদে হাস্য কৌতুকে তার সমস্তদিন কাটত। প্রমীলা কালিদাস ও মহেন্দ্রকে নিয়ে আমার সঙ্গে তাসের আসর জমাত। আমি যখন থাকতাম না তখন আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যেঠিমা চতুর্থের স্থান অধিকার করতেন।

(৩)

কালিদাস যে দিন আমার বেহালাখানি নিয়ে গেল সেদিন হঠাৎ সে বেহালা কেনার সময়কার কথা মনে পড়ল। তারপর প্রায় আট বৎসর কেটে গেছে। এই আট বৎসরে আমার জীবনে বাহিরের পরিবর্ত্তনের হিসাবে মাথায় টাক ও গোঁপে পাক ধরা ছাড়া এবং আফিসে বেতন বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য আছে বলে মনে হয় না। ভিতরে যে ভাঁটার টান পড়েছে এই কথাটা বেহালা কিনবার দিনগুলি স্মরণ করে অনুভব করলাম। সে ভরা গাঙের অনেক নীচে এখন জল নেমে এসেছে। আমার সে গান বাজ্‌নার মজ্‌লিস্ আর নাই। দ্বিতীয় বিবাহের পরে যখন থেকে সন্ধ্যার পর বৈঠকখানা অপেক্ষা অন্দরেই বেশীক্ষণ কাটাতে সুরু করলাম সেই সময় আমার পূর্ব্ব বন্ধুরা একে একে আমার বাড়ী আসা ছেড়ে দিলেন। তারপর ক্রমে যখন আমার অন্দর ও বৈঠকখানা দুইই ত্যাগ করে সন্ধ্যার পর পুরাতন বন্ধুদের আখ্‌ড়ায় তাস দাবা ও গুড়্‌গুড়ির সেবায় মন দিলাম তখন আমার সদর ও অন্দর কালিদাস মহেন্দ্র ও তাহাদের অনুচরবৃন্দ পাড়ার

ছোটছেলেরা ক্রমশঃ কেমন করে দখল করে ফেলল তা আমি বলতে পারি না। প্রকৃতি কোনও জায়গায় ফাঁক রাখতে চান না। আগাছা দিয়ে ফুলের বাগান ভরে তোলেন। পোড়ো বাড়ীর ছাদে নিজের হাতে অশ্বত্থ গাছ পুঁতে যান্।

এই কয় বৎসরে কালিদাস ও মহেন্দ্র এণ্ট্রাস, এফ্, এ ও বি, এ এক সঙ্গে পাশ করে এসেছে এখনও তাদের জোড় ভাঙ্গে নি। তু'জনেই এম্, এ পড়ছে—কালিদাস সাহিত্যে ও মহেন্দ্র বিজ্ঞানে। প্রমীলার আনুকূল্য ও উৎসাহে ছেলেদের সখের দলটি আমার বৈঠকখানার আশ্রয়ে দিব্য গজিয়ে উঠেছিল। কালিদাস এখন শুধু গাইয়ে বাজিয়ে নয়, ছবি আঁকতেও সিদ্ধহস্ত। ছেলেরা যে সব অভিনয় করত তার রচনা ও দৃশ্যপট তুইই কালিদাস ও প্রমীলার কলম ও তুলির টানে বাহির হত। এই কয় বৎসরে আমার আসল ও পাতানো ভাগে তুটি যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করে চলেছিল সেই সঙ্গে তাদের এজমালী মামীটীকেও টেনে নিয়ে চলেছিল। আমি এতে খুসী ছিলাম। প্রমীলার সন্তানাদি হয় নি। সে যে সমস্ত দিনের সুদীর্ঘ অবসরটিকে এই রকমে শিল্প ও সাহিত্য চর্চ্চায় সার্থক করে তুলছে তাতে আমি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করতাম, মালীর হাতের ফুলবাগানের শোভায় বাগানের মালিকের যেমন গর্ব্ব হয়। আমি মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে ছেলেদের অভিনয়ের দর্শক হয়ে তাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করতাম।

প্রমীলা আমার বড় মনের মতন ছিল। এই সুদীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে মনে পড়ে না একদিনও তাহার সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতান্তর হয়েছে কিনা। হাঁস যেমন জলে নেমেই অবলীলাক্রমে সাঁতার দিয়ে বেড়ায় তেমনি সহজেই সে আমার জীবনের উপর মরালের মত ভেসে বেড়াত। তার কোনও বালাই ছিল না। আমাকে কোথাও বাধা দিত না। এমন পূর্ণ তৃপ্তি আমার প্রথম স্ত্রী আমাকে দিতে পারে

নাই। তার ভালবাসার মধ্যে কেমন একটা অতৃপ্তির দাহ ছিল যেটা আমার মোটেই ভাল লাগত না। আমাদের বাড়ীতে একটা দাসী ছিল। তার আহারের মাত্রা সাধারণ দাসদাসী অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল। জ্যেঠিমা তাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। ঠাকুর দ্বিতীয় বার ভাত দিয়ে গেলেও নিমিষেই থালাটি চেটে চুটে পরিষ্কার করে যখন সে সতৃষ্ণ নয়নে রান্না ঘরের দিকে তাকাত তখন জ্যেঠিমা রাগ করে বলে উঠতেন, "মাগী খায় দেখ, কিছুতেই আর পেট ভরে না!" আমি জ্যেঠিমাকে সেজন্য ভৎর্সনা করেছি বটে, কিন্তু বলতে কি, আমার প্রথমা স্ত্রীর ভাব আমার ভালবাসা সম্বন্ধে কতকটা যেন সেই রকমের ছিল। কিছুতেই যেন তার প্রাণ ভরত না। দাসীর সম্বন্ধে জ্যেঠিমার বিরক্তি যেন আমার মনে আমার স্ত্রীর অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার প্রতি জেগে উঠত। আমি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেশীক্ষণ বৈঠকখানায় কাটালে সে ছটফট্ করে বেড়াত। রাত্রে এই নিয়ে মিছামিছি কলহ করত—তার চোখের জল আমাকে অস্থির করে তুলত। সে আমাকে একটু কম ভালবাস্‌লে আমি বেঁচে যেতাম। পূর্ণশশীর (আমার প্রথমার নাম পূর্ণশশী) যখন সন্তান হ'ল তার ছেলের প্রতি মমতাও এইরূপ প্রবল আকার ধারণ করল, আমিও কতকটা হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর দুই বৎসরে সে যখন ছেলেটিকে হারাল তখন তাকেও আর রাখতে পারা গেল না। ছেলের মৃত্যুর তিনমাস পরে সেও মারা গেল।

(৪)

জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমার শোবার ঘরের সামনের ছাদে মাদুর পেতে প্রমীলা ও মহেন্দ্র বসে। কালিদাস উঠানের দিকের রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার সেই বেহালা-খানা বাজাচ্ছে। প্রমীলা ও মহেন্দ্র একটু সরে বস্‌ল, আমিও মাদুরে

স্থান পেলাম। কালিদাস না থেমে বাজাতে লাগল। প্রমীলার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়েছিল। আর পড়েছিল কালিদাসের বেহাগ রাগিণীর ছায়া। চমৎকার বাজাচ্ছিল—আমার সেই বেহালার এমন সুর আমার হাতে ত এ সুর কোন দিন বাহির হয়নি! বেহালা থামলে আমি খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বাহবা দিলাম। মহেন্দ্র বল্‌ল, "দেখ্‌ছ মামা, তোমার বেহালায় কি সুর বেরিয়েছে!" প্রমীলা কোন কথাই বল্লে না। একটু পরেই সে উঠে পড়ে বলে, "যাইগে, তোমাদের খাবাড় যোগাড় করি।" আমি বল্লাম, "আর একটু বোসো না, একটা চুট্‌কি গোছের কিছু শুনে যাই। খুব গিটকারি টিটকারি দিয়ে একটা ঝিঁঝিট-খাম্বাজ বাজা না, দেখি তোর কেমন হাত হয়েছে।" প্রমীলা বলল, "না থাক, বেহাগের পর ও ভাল লাগবে না।" এই তার মুখে প্রথম আমার কথায় প্রতিবাদ শুনলাম। প্রমীলার বারণ শুনে কালিদাস ও বেহালা নামিয়ে বল্লে, এখন থাক, আর একদিন শোনাব। চট্ করে গানের আসরটা ভেঙে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলেই কালিদাস বাড়ী চলে গেল। ছাদে পাতা মাদুরের উপর বসে আমার গুড়্‌গুড়িতে মন দিলাম। বারাণ্ডায় প্রমীলা খেতে বসেছিল। আমি তখন কি ভাবছিলাম ঠিক বলা শক্ত। আমার হুঁকার ধোঁয়ার মতই মনের সে ভাবটা অস্পষ্ট, তাকে কথায় প্রকাশ কর্‌তে হলে হুঁকোর ওই গুড়্‌গুড়ে ভাষারই আশ্রয় নিতে হয়। মনের মধ্যে একটা ধোঁয়াটে আবছায়ার ভিতর অস্ফুট ভাষায় যখন আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছে এমন সময় জ্যেঠিমার স্বর কানে এল, "একি বৌমা, পাতে যে সবই পড়ে রইল, নাও এই আমটা খাও!" আমটা পাতে পড়বার শব্দ আমার কানে গেল, হুঁকাটা আপনা আপনিই চুপ করে গেল। "কেন মিছামিছি আমটা এঁঠো করলে, আমার ক্ষিদে নেই, জ্যেঠিমা"—বলে প্রমীলা পাত ছেড়ে উঠল।

বিছানায় শুয়ে প্রমীলাকে বললাম "বাস্তবিক, বেহাগ রাগিণীটা বড় চমৎকার। কালু বাজাচ্ছিল বেশ!" প্রমীলা বলিল, "হুঁ"। কিন্তু আমার এই অভিমতটাকে সংক্ষিপ্ত একটা "হু" র সায় না দিয়ে সে যদি একটা বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করত তা হ'লে আমার বেশী ভাল লাগত। ডাক্তার যখন রোগীর বুকে "ষ্টিথেস্কোপ্" লাগিয়ে তার বুক পরীক্ষা করেন তখন বুকের সহজ ধুক্‌ধুকানির চেয়ে তার ব্যতিক্রমটাকে অন্বেষণ করেন। আমি বললাম, "তবে বেহাগের চেয়ে ঝিঁঝিট-খাম্বাজে সুরের কারুচুপি আছে। বেহাগের সুরগুলো টানা টানা, কেমন একঘেয়ে, যেন ফিতে পাড়, আর ঝিঁঝিটটি ঠিক্ যেন কল্কা পেড়ে।" প্রমীলা আমার সঙ্গে যেন একমত হয়েই বললে, 'তা সত্যি, বেহাগের টানগুলি মনের উপর দিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন সমানে চলে যায়, মাঠের উপর দিয়ে একটা উদাস হাওয়ার মত। খোলা আকাশের তলে, স্তব্ধ রাত্রে সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়েছে—তখন ঠিক খোলে। ঝিঁঝিট্-খাম্বাজ যেন বেড়া দেওয়া বাগানে নানা রংবেরঙের ফুলের কেয়ারির মত না?" আমি বল্লাম "হুঁ"। আমার এ সংক্ষিপ্ত উত্তরটাতে যেন তার তৃপ্তি হল না। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় বলত? আমার ত মনে হয় বেহাগের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা আছে, যা অন্য কোন সুরে নাই।" আমি বল্লাম, "কেন? ভৈরবীতে?" সে বলল, "হাঁ, ভৈরবীতে আছে বটে, কিন্তু তা' শুধু ব্যাকুল মিনতি, অনুনয়। সে অনুনয়ের পিছনে বেশ একটা ভরসা আছে যে আমার প্রার্থনা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। সে কেবল পাবার আশায় কান্না। পূরবীতে যেমন নিরাশার কান্না, পেলাম না বলে কান্না। কিন্তু বেহাগে পেয়ে হারানর কান্না, যা নিশ্চয়ই পাব না জানি তার জন্য কান্না। আশাহীন, ভরসাহীন চির অতৃপ্তির কান্না।"

সঙ্গীত জিনিষটা আমি ভালবাসি বলেই আমার বিশ্বাস। সুরও

তালের বৈচিত্র্যের নেশা বরাবরই আমার কানে আছে। কিন্তু তাই বলে রাগরাগিণীর এরূপ তুরীয় ব্যাখ্যা আমার কাছে বড় খাপ্‌ছাড়া ঠেকল। অনুনয়, আশা, নিরাশা, কান্না—এসব কি হেঁয়ালী! পাবার কান্না, না পেয়ে কান্না, পেয়ে হারানর কান্না! আমি হেসে উঠে বল্লাম, "কান্নার যে এত রকমারি আছে তা' আমার জানা ছিল না। একটা নূতন কথা শেখা গেল বটে। আর কোনও রকমের কান্না নাই?" প্রমীলা চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো তার মুখে পড়েছিল। দেখি দর দর ধারে তার দু'চোখ দিয়ে জল উছলে পড়ল। আমি ঠিক এই কান্নাটার জন্য ত প্রস্তুত ছিলাম না। একটু বিরক্ত হয়ে কৌতুকভঙ্গীতে উপহাস করে বল্লাম, "এ আবার কি?" কান্নাটা সুরে না গেয়ে কি বাৎলিয়ে দেখান হচ্ছে বাইজি?" একটা চাপা স্বর কেঁপে কেঁপে তাকে বিদীর্ণ করে হঠাৎ যেন ফিন্‌কি দিয়ে তীব্র সুরে বাহির হয়ে গেল। প্রমীলা বালিশে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্নার দমকে আমার খাটখানি দুলছিল। ঠিক এমনি করেই এই খাট বহু বৎসর আগে মাঝে মাঝে দুলত। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম। এত বৎসর পরে কি পূর্ণশশীর ভূত প্রমীলার ঘাড়ে চাপল?—না, সন্তানাদি হয়নি বলে হিষ্টিরিয়ার সূত্রপাত? পরদিনই ডাক্তারের পরামর্শ নেব ঠিক করলাম।

অসমাপ্ত

দার্জ্জিলিং-এ পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একখানি বাড়ী। বাড়ীর সামনে সার্শি-আঁটা বারাণ্ডা। বারাণ্ডার থেকে সম্মুখের গভীর উপত্যকার তল পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তুধারের জঙ্গলে মোড়া উঁচু পাহাড়-গুলি সেই গভীরে গিয়ে যেখানে মিশেছে সেখানে বালির সূক্ষ্মরেখা ধরে তিস্তা নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। সেই উপত্যকার সুগভীর নিভৃতির মধ্যে অবিশ্রান্ত মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলেছে। সম্মুখে উপরের দিকে তাকালে কেবল চোখে পড়ে পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ সুদূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। তাদের মাথায় মাথায় আকাশের নীলচন্দ্রাতপের মেঘের ঝালরগুলি যেন লুটিয়ে পড়েছে।

সেদিন ঝক্‌ঝকে রোদে চারিদিক্ আলোয় আলো। উপত্যকায় পাহাড়গুলির বুকের উপর, মাথার উপর, এখানে ওখানে সাদা সাদা পুঞ্জমেঘে সেই অপূর্ব্ব আলোয়—যে আলো মনে হয় যেন ঘনীভূত চন্দ্রা-লোক—সেই গাঢ় জ্যোৎস্নায় জটলা বেঁধে রোদ পোহাচ্চে। একটি কৃশা গৌরবর্ণা যুবতী খানিকক্ষণ সেই আকাশ উপত্যকা ভরা আলো চোখ ভরে পান করলেন, তাঁর চোখ দুটি যেন আলোয়, ভরপূর হয়ে ছল্‌ছল্ করতে লাগল। তারপর সামনের একটা টেবিলের ধারে বসে চাম্‌ড়া-বাঁধানো চিঠি লেখার পাত্তাড়িটি খুলে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। রোগশীর্ণ হাতখানিতে ঢিলে সোণার চুড়ি আর সোণা বাঁধানো লোহা —সেই আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছিল। ফস্‌ফস্ করে পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছিলেন। লিখতে লিখতে তাঁর পাণ্ডুর গালে একটা রক্তিম আভা যেন ফুটে উঠল। চিঠি খানা এই :—

দার্জ্জিলিং, Connie Villa.

১৮।১০।—

বারাণ্ডা, বেলা ৩টা।

আমার—,

কি সুন্দর আলোয় আজ সব জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। কৌচে শুয়ে শুয়ে Eucalyptus-এর পাইপ'টা টানছিলাম আর তোমার কথা ভাবছিলাম। আর কি থাকতে পারা যায়! তোমার কাছে ছুটে এলাম, একটিবার তোমার বুকের ধনকে বুকে নাও।

আজ সকালে ডাক্তার ঘোষ এক নূতন ডাক্তারকে নিয়ে এসে হাজির। ওগো, ভয় নাই গো, তোমার বুকের ধনটিকে যমরাজ এখন নিতে পারছেন না। নূতন ডাক্তার বাবুর আধমাথা টাক্ আর বাকি আধখানা চক্‌চকে রূপার চুলে ভরা। পাকা আমটির মত রং, সাদা সাদা ভ্রূদুটির মাঝখানে গাঢ় চিন্তার রেখা আঁকা। দেখে মনে হ'ল খুব অভিজ্ঞ লোক। দুই ডাক্তারে মিলে ত অনেকক্ষণ আমার বুক পরীক্ষা করলেন। সেই একই প্রশ্ন, জোর করে নিঃশ্বাস নিতে বলা, আঙুলের উপর আঙুলের হাতুড়ি ঠুকে বুকের ভিতরটার প্রতিধ্বনি শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দুজনে মিলে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে কত কি পরামর্শ করা হ'ল। তারপর বড় ডাক্তার বাবু আমার পাশের চেয়ারে এসে বস্‌লেন। বুঝলাম আমাকে ভরসা দেওয়া উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু মিনিট পনেরো ধরে যা বল্লেন তাতে বেশ বুঝলাম দিব্যি গুছিয়ে মিথ্যাকথা বলবার মত তাঁর শক্তি আছে। কিন্তু মেকি টাকা যত চক্‌চকেই হোক্ টোকা মারলেই ধরা পড়ে। যে সহজ সত্যটা অনেক সময় চোখে পড়ে না, মিথ্যার রঙিল আবরণটা যে তাকে বিশেষ করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তাই অনেক সময়ে মিথ্যা দিয়েই সত্যকে সহজে ধরা যায়। আমার বুকের ধুক্‌ধুকুনিটা

হঠাৎ যেন দ্বিগুণ আবেগে জেগে উঠল। ওগো, তুমি কি সে মুহূর্ত্তে ডাক্তারের মনের কথা জানতে পেরেছিলে তাই তোমার বুকের স্পন্দনটা আমার বুকে এসে মিশেছিল! আমি ত জানি তুমি কি রকম আগ্রহের সঙ্গে ডাক্তারের অভিমত জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতে! আর আমিও যে বাঁচতে চাই, তোমার জন্য বাঁচতে চাই, আমার জন্য বাঁচতে চাই। তোমাকে ফেলে যেতে কি আমার প্রাণ সরে? তাই এই প্রাণকে বাঁচাবার জন্য দুজনের প্রাণের ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে ডাক্তারের কথা শুনবার প্রতীক্ষায় ছিলাম।

তুমি ত জান আমি কত মুখচোরা। লোকের সামনে আমি লজ্জায় কি রকম অভিভূত হয়ে পড়ি—কত সময়ে তুমি তাই নিয়ে আমাকে কত ঠাট্টা করেছ। কিন্তু আজ আমার সে লজ্জা কোথায় গেল! আমি বাঁচবার সঙ্কল্পে যেন কঠোর হয়ে গেলাম, আমার দ্বিধা সঙ্কোচ কোথায় লুকাল; কত কথাই বলে ফেল্লাম। ডাক্তার বাবুকে জোর করে বল্লাম 'আমার কাছে কিছু লুকিয়ে লাভ নাই, ঠিক্ সত্য কথা আমাকে বলুন, তাতেই আমার উপকার হবে।' তিনি যেন ঠিক্ বুঝলেন। বল্লেন যে ডাক্তারি শাস্ত্রের জটিলতা বাদ দিয়ে আসল কথা যা আমাকে বলবেন। বল্লেন, 'যেমন নিয়মিত ওষুধপত্র চলছে তেমনি চলুক। যদি শারীরিক অথবা মানসিক সব রকম উত্তেজনা পরিত্যাগ করে নিয়মিত পথ্যের উপর থাকি, শীতের আরম্ভ পর্য্যন্ত পাহাড়ে পাহাড়ে এবং অন্য সময় সমুদ্রের ধারে থাকি তাহ'লে ('যদি' গুলো ভুলো না) তাহ'লে হয়ত অনেক বৎসর বেঁচে যেতেও পারি, অন্ততঃ একটা বৎসর যে বাঁচবই তা' তিনি শপথ করে বলতে পারেন। শুনলে প্রবীণ ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী?

সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর কথা শুনে আমার মনটা দমে গেল, আমি জানি তোমারও যাবে। শরীরটাকে কোনও রকমে তালিজোড়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই কি প্রাণে বাঁচা হয়? তাহ'লে ত মিশরের

'মামি'গুলো এখনও বেঁচে আছে। না গো না, আমি অমন বাঁচা বাঁচতে চাই না। আমার জন্যও না, তোমার জন্যও না। বুড়ো ডাক্তার জীবনের রহস্যের কথা জানবে কি? ওকি আমার মত কাউকে ভাল বেসেছে? আমি যে তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে যে ভাল বেসেছে সে কি ওই 'মামি'র মত হয়ে বেঁচে থাকতে পারে? ডাক্তার আমাকে একটা বৎসর অন্ততঃ সময় দিয়েছেন। আমি সেই একটা বৎসর তোমাকে নিয়ে আমার মতন করে বাঁচতে চাই। এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে তাই সব ঠিক্ করছিলাম। কেমন করে আমার এই এক বৎসর—আমাদের এই একটিমাত্র বৎসর—আমরা ছ'জনে মিলে কাটাব। আমার প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। যেটুকু এখনও বাকি আছে সেটুকু এস তোমার প্রদীপে নিঃশেষে ঢেলে দিই। একটি শিখায় দু'জনে জ্বলব।

কি ঠিক্ করেছি জান? তোমার হাতে ত কিছু টাকা আছে। আমাদের বড় সাধের যে সন্তান—আজও যে আমার কোলে ভূমিষ্ঠ হয় নাই এবং আর হবেও না, যে আমাদের এ জন্মের মত কেবল স্বপ্ন-পুত্তলিকা হয়েই রইল—তার মুখ চেয়ে আমরা খরচ পত্র বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যে ক'টি টাকা সঞ্চয় করেছিলাম সে টাকা কি শুধু আমার ওষুধ আর চেঞ্জের ভস্মে ঘি ঢালবার জন্য এত কষ্ট করে রেখেছিলে? না গো না। তা কিছুতেই হবে না। এই একটা বৎসরের জন্য তুমি ছুটি নাও। এই একটা বৎসরের জন্য তোমার বিষয় কর্ম্ম শিকেয় তোলা থাক্। আমাকে আমাদের সেই ঘরে আবার নিয়ে চল। সেই ঘর, প্রথম যে দিন সে ঘরে পা দিয়ে সর্ব্বদেহমনে বুঝেছিলাম—'এই আমার বাড়ী, আমার ঘর।' আর ছাড়াছাড়ি নয়, এই যে কটা মাস হাতে পেয়েছি এস একবার দুজনে তার প্রত্যেক মুহূর্ত্তটির মধুটুকু নিঃশেষে নিঙ্ড়ে নেই। আমার এই যে রূপ—তা ভাল হোক্ মন্দ হোক্—তোমার চোখে তো সুন্দর—তা এখনও একেবারে ফুরায়নি। কেন আমি

মরবার আগে তাকে রোগের আগুণে পুড়ে ছাই হতে দেব? আমি যখন মারা যাব তখন তাকে চিতার আগুণে পুড়তে দিও। তার আগে তাকে তুমি এমন করে ব্যর্থ হতে দিও না।

আমাদের সারা জীবনের সব ক্ষুধাতৃষ্ণা, অভাব-অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা এই কয়টি মাসে মিটিয়ে নিতে হবে। আর কি আমাদের সময় নষ্ট করবার সময় আছে? আর আমার কোনও রোগ নাই। রোগ ত আর কিছুই নয়—কেবল মৃত্যুর ছায়া। এই একটা বৎসর যখন বাঁচব বলে স্থির করেছি তখন মৃত্যুর ছায়া আমার প্রাণের ত্রিসীমায় আসতে দেব না। হাউই যখন আগুণের একটানা রেখায় ছুটে গিয়ে নিভবার আগে সমস্ত আকাশ আলো করে হাজার তারায় ঝড়ে পড়ে, আমি তেমনি করে তোমার ওই বুকটির ভিতর একবার জ্বলে উঠে নিভে যাব। একটা টিম্‌টিমে প্রদীপের নিভ-নিভ শিখায় প্রাণের আগুণটুকুকে বিশ বৎসর ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

স্পর্শমণি আমার—একটিবার এসে আমাকে স্পর্শ কর। যে স্পর্শে সমস্ত দেহ নিমেষে বাষ্পীভূত হয়ে আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়, যে স্পর্শে আত্মা জমে রক্ত হয়ে যায়, বন্যার মত দেহের প্রতি শিরা উপশিরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তোমার সেই স্পর্শটির জন্য আজ আমার দেহ মন আকুল হয়ে উঠেছে। আজ আমার কোনও সঙ্কোচ, কোনও লজ্জা নাই। তুমি আর আমি যে অভিন্ন—আমার কাছে আমার কিসের লজ্জা?

বল তুমি আসবে—তুমি এই চিঠি পেয়েই আমাকে এসে নিয়ে যাবে—এক মুহূর্ত্ত দেরী করবে না—এক মুহূর্ত্তও না—এখনি তবে এস, এই মুহূর্ত্তেই ওই বুকে—

* * * *

শিথিল আঙুলের বন্ধন থেকে কলমটি চিঠির এইখানে এসে খসে

পড়ে গেল। যুবতীর মাথা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। ঠিক্ এই সময়ে বাহিরের দরজায় শব্দ শোনা গেল। মরণাহত পত্নীর প্রবাসী স্বামী পূর্ব্বরাত্রে ডাক্তারের টেলিগ্রাম পেয়ে রুগ্না স্ত্রীকে দেখতে এসেছেন।

চিঠি

পরেশ তাহার বন্ধু তারক-দা'কে চিঠি লেখা শেষ করিয়া খামে ভরিবে এমন সময় তাহার ছোট ভাই রমেশ ছুটিয়া আসিয়া বলিয়া গেল, "দাদা, তোমাকে মজুমদার মশায় ডাকছেন।" শুনিবামাত্র রমেশ শশব্যস্ত হইয়া বহির্বাটি অভিমুখে ধাবিত হইল, চিঠিখানি তাহার শুইবার ঘরের টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। ইত্যবসরে প্রতিভা ঘরে ঢুকিয়া তাহার স্বামীর লিখিত চিঠিখানি দেখিতে পাইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ঘরে খিল্ দিল এবং চিঠিখানি একবার নয়, দুইবার পড়িল। চিঠিখানি এই :—

ভাই তারক-দা'! আজ সকালে তোমার চিঠি পেলাম। আমিই উত্তর দিতে বসেছি—যাকে বলে পত্রপাঠ জবাব, এবার আর আমাকে দোষ দিতে পারবে না। কথাগুলো বার হবার জন্য মনের দরজায় জটলা করে ছিল, এমন সময় তোমার চিঠি এসে বাহির থেকে সে দরজার শিকল খুলে দিল। যে বাতাসে আকাশের মেঘ বৃষ্টি হয়ে নামে, সেই বাতাস তোমার চিঠিখানি আমার প্রাণের ভিতর এনেছে,—এখন তোমার ভিজবার পালা। আকাশ-ভরা মেঘকে মেঘমল্লার রাগিণীর স্বরে মুষলধারে যখন নামিয়ে এনেছ, তখন তুমিই বা কেন বেকসুর খালাস পাবে? আমি জানি, আমার চিঠির এইটুকু পড়েই তুমি ছাতি খুলে বসবে, দিব্য গা বাঁচিয়ে আকাশের কান্না উপভোগ করবে। তোমার কাছে আত্ম-নিবেদন করার মত আত্মাবমাননা আর নেই। তবু, সব জেনে শুনে তোমাকেই "Father Confessor" করেছি।

তোমাকে কিছু বলতে চাই না কিন্তু না বলেও পারি না। চুপ্‌টি করে যখন আমার কথা শোনো তখন মনে হয় বুঝি দুনিয়ায় এমন দরদী, এমন সমঝ্‌দার আর কোথাও পাব না। কথায় মানুষ কতটুকু বলতে পারে যদি সেই কথার পিছনে অকথিত এবং অকিথতব্য অবশিষ্ট যা-কিছু প্রাণের ভিতর থেকে গেল, সেই চিরমূক সুখ এবং দুঃখের সঙ্গে শ্রোতার নিগূঢ় পরিচয় না থাকে? তোমার মুখের ভাব দেখে মনে হয়, তুমি আমার অন্তর্দ্দর্শী,—আয়নার মত যেন তোমাকে দিয়ে আমি আপনাকেই দেখতে পাই। কিন্তু আমার কথাটি শেষ হলে যখন তোমার মুখ ফোটে, তখন? তখন ভাবি, তোমার মত নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, অবুঝ, সহানুভূতি-হীন দুনিয়ায় আর কেউ নেই। বুঝি, তোমার কাছে কিছু বলা অরণ্যে রোদন মাত্র। তবু যখন কাঁদবার দরকার হয়, তখন ওই অরণ্যের দিকেই মন ছুটে যেতে চায় কেন?

আচ্ছা, তোমার কোন্‌টা সত্যি—তোমার মুখের ভাব, না ভাষা? আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমাকে ভুল বুঝতে পার না, তবে প্রত্যেকবার অতগুলো করে মিথ্যা কথা বল কেন? তুমি কি সত্যিই মনে কর, আমি এতই বোকা যে, তোমার স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা পাব! এ রকম সদয় অত্যাচার যে আমার পক্ষে কত দুর্ব্বিসহ, তা' তুমি কি বুঝতে পার না? ঠিক সত্য কথা,—হোক্ তা যত অপ্রিয়, যত নিদারুণ—একবার বল। তোমার মুখ থেকে আসল কথাটি কি কোনদিন বাহির হবে না? একই কথা প্রত্যেকবার কেবল ভাষান্তর করে বললে রচনার বাহাদুরী দেখান যেতে পারে বটে কিন্তু বক্তব্যটি ত বদলায় না। তুমি ঘুরেফিরে কেবল একই উত্তর আমাকে দেবে? তবু বলবে যে প্রমীলা আমাকে ভালবাসে? তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলি নাই এবং বলতে চাইনে। ভালবাস্‌তে না পারা অক্ষমতা হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়, তা' আমি জানি। তবু কেন লিখেছ যে, আমার অভিযোগ অসত্য?

অভিযোগ, আমি ত কোন অভিযোগই করিনি। অভিযোগ কিসের? সে আমাকে ভালবাসে না—এই নিদারুণ সত্যটি তোমার কাছে প্রকাশ করেছি। তুমি তার হ'য়ে যেরূপ ওকালতী করেছ, তা'তে তোমার বুদ্ধির ও কল্পনা-শক্তির প্রশংসা না হয় করলাম, কিন্তু তোমার কূটতর্কে ও কবিত্বে ত আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবার সম্ভাবনা নেই।

আচ্ছা তোমার যুক্তির দৌড়ই বা কতদূর—তাই একবার বিচার করে দেখা যাক। তুমি লিখেছ যে, তার কাছে কোনও দাবী যেন না করি, তাকে তার নিজের মতন করে আত্মনিবেদন করার অবসর আমার দেওয়া উচিত; আমাদের হিন্দু সমাজের ব্যবস্থানুসারে সহধর্ম্মিণী পদারূঢ়া হলেও, চিরন্তন মনের প্রকৃতির অভিব্যক্তির পর্য্যায় হিসাবে সে এখনও বালিকা মাত্র। আচ্ছা ষোল বছরের মেয়েকে তুমি বালিকা বলতে চাও? তোমার উত্তর আমি এখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি। বলছ যে ষোল বছরের ম্যাট্রিক ক্লাশের ছোক্‌রাকে কি আমি শেলি ব্রাউনিং পড়ে শোনাবার জন্য আকুল হই?—হয়ত হই না। কিন্তু ষোল বছরের ছেলে আর মেয়েতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, তা কি স্বীকার কর না? বিশেষতঃ আমাদের দেশে ষোল বছরের নারী ঘরে ঘরে মাতৃমূর্ত্তিতে বিরাজ করছে। তাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, স্নেহসেবার মুক্তধারা কত ধনী দরিদ্রের গৃহে কলস্বনা নির্ঝরিণীর মতই বয়ে যাচ্চে। এটা কি আমার কল্পনা? এর মধ্যে কি কোনো সত্য নেই? আর তুমি যে বল, তার বাপ মা তাকে বড় করে বিয়ে দিয়েছেন এবং পাত্রনির্ব্বাচনের সময় সে আমার চেয়ে সৎপাত্রগুলিকে অগ্রাহ্য করে আমাকে বিবাহ করার সম্মতি জানাবার পর তবে আমার সহিত তার বিবাহ সম্ভব হয়েছে—কেবলমাত্র এই ঘটনাটি (সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন!) অবলম্বন করে 'সবুরে মেওয়া ফলাবার, আশায় আমি ভবিষ্যতের পানে বদ্ধাঞ্জলি ও বদ্ধদৃষ্টি হ'য়ে চুপ করে বসে থাকব? কেন

যে সে আমাকে বিয়ে করেছিল, এর কোনো সদুত্তর ত তার কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত পেলাম না। যে জন্যেই হোক্, আমাকে বিয়ে যখন করেইছে তখন এরকম বিমুখতাতে কি প্রমাণ হয় না যে, এখন নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে পসতাচ্চে? হয়ত যদি স্বেচ্ছায় আমাকে বরণ না করত তা' হলে আমার সম্বন্ধে এতটা বিরুদ্ধতা তার মনে জাগত না। তুমি যে বল, সে বয়সের আন্দাজে ছেলেমানুষ তার জন্য কোনও প্রমাণ ত আমার চোখে পড়ে না। আমাদের বাড়ীর আর সকলের প্রতি ব্যবহারে ত তার কোন ছেলেমানুষীই ধরা পড়ে না। যত শিশুত্ব কি কেবল আমার বেলাই? কিন্তু এসব কথা তোমাকে বলে লাভ কি?

এবার পূজার ছুটিতে বাড়ী আসবার সময় তুমি শিয়ালদ ষ্টেশনে আমাকে যে কথাটি বলেছিলে, তার ঠাট্টার সুর ও হাসিটি আমি এখনও হজম করতে পারিনি। বলেছিলে যে, ভাল জাতের আম—যেমন ল্যাঙ্‌ড়া, ফজলি—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে পাকে না, আষাঢ়ে ফলে,—একটু বর্ষার প্রয়োজন। তোমার পাঁজিতে কি বলে? সে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস'টি এখন কতদূর? তোমার চিঠির শেষ উপদেশটি পালন করা এখানে থেকে আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি লিখেছ যে, আমি যেন তার কাছে ভালবাসার কোনো দাবী না করি। শুধু লিখেই ক্ষান্ত হওনি, লেখার নীচে দুটো দাঁড়ি টেনে কথাটা বিশেষ করে আমার দৃষ্টিগোচর করবার ব্যবস্থা করেছ। তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে এমন তৃষ্ণানিবারক "প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্" তোমার কলমের যোগ্যই বটে! তথাস্তু। কিন্তু এ "প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্" খানা যদি শেয়ালদ ষ্টেশনে আমাকে দিতে তা'হলে ঢাকা মেলে না চড়ে দার্জ্জিলিং মেলে চড়তাম। তবু তোমার কথাটা যে কতদূর ভুল তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি সত্যই স্থির করেছি যে, কালই দার্জ্জিলিং রওনা হব। মজুমদার মশায় কাল দার্জ্জিলিং যাবেন শুনেছিলাম। তোমার চিঠি পেয়েই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি। আজই তাঁর সঙ্গে

পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলব। তিনি বাবাকে আমার হয়ে অনুরোধ করলে বাবা আপত্তি করবেন না আশা করি।

আজ এখানেই চিঠি শেষ করি। বাস্তবিক, তোমাকে হিংসা হয়,—দিব্যি আছ, কোনও বালাই নেই। নিজের টিকিটি অক্ষুন্ন রেখে আর সকলের টিকি-কাটার জন্য তোমার এমন শিরঃপীড়া কেন বল ত? তুমি নিজে বিয়ে করবে না ঠিক্ করেছ বলেই কি বন্ধুবান্ধবদের ঘাড়ে বিয়ের কাঁঠাল ভাঙ্‌বার তোমার এমন আগ্রহ? তোমার পাল্লায় না পড়লে আমি কখনও এমন বিয়ে করতাম না। আবার তোমারই প্ররোচনায় অস্থায়ী বিপত্নীকত্ব বরণ করে নিচ্চি। তবে এটা অস্থায়ী কি স্থায়ী হবে, সে শেষ মীমাংসার ভার এবার আমার হাতে নেব, এবং যদি স্থায়ীই হয়, তার প্রতিশোধ নেব তোমার গলায় একটি বৌদিদি বেঁধে দিয়ে। ইতি

ভাগ্যহীন

পরেশ।

পরেশ যখন মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরদিন দার্জ্জিলিং যাইবার বন্দোবস্ত পাকা করিয়া উপরে ফিরিল তখন প্রমীলা পাশের স্নানের ঘরে ঢুকিয়াছে। রমেশ ঘরে আসিয়াই চিঠিখানি খামে ভরিয়া টিকিট আঁটিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকে দিবার ব্যবস্থা করিল এবং নিঃশব্দে ঘরে পাইচারি করিতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে স্নান সমাপনান্তে প্রমীলা অন্যমনস্কভাবে সে ঘরে আসিয়া চুল আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল। পরেশের চিঠিখানা গ্রামোফোনের চাক্তির মত তার মনের মধ্যে সশব্দে ঘুরপাক খাইতেছিল।

পরেশ পাইচারী করিতে করিতে ফিরিয়াই প্রতিভার কেশ-প্রসাধন-তৎপর উর্দ্ধক্ষিপ্ত বাহুর হিন্দোল লক্ষ্য করিল এবং নিঃস্পন্দ নয়নে স্থির

হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। সম্মুখের আয়নার প্রতিবিম্বখানি এবং পশ্চাৎ হইতে দেহলতার মৃদু আন্দোলনটি প্রমীলার পরিপূর্ণ দেহ-শোভায় তাহার বিমুগ্ধ দৃষ্টিটি ভরিয়া তুলিল। হঠাৎ প্রতিফলিত কাহার ছায়ামূর্ত্তি প্রমীলার চোখে পড়িল। সে চমকাইয়া পিছনে তাকাইয়াই একছুটে স্নানের ঘরে গিয়া লুকাইল। পরেশও ক্ষিপ্রপদে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বেচারীর নিভৃত অন্তরালটুকু নিমেষে অধিকার করিল এবং পর মুহূর্ত্তেই প্রতিভাকে বাহুপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, প্রতিভা আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টামাত্র করিল না। শুধু তাহাই নয়, ভরসা পাইয়া পরেশ তাহার সদ্যস্নাত পুষ্পতুল্য মুখ-খানিতে একটি চুম্বন দিবে কিনা এইরূপ ইতস্ততঃ যখন করিতেছে তখন হঠাৎ প্রমীলা তাহার মাথাটি মুখের কাছে টানিয়া লইয়া একটি—একটি-মাত্র চুমা দিয়াই পরেশের বজ্র-আটুনির সে মাহেন্দ্রক্ষণের ফস্‌কা গেরোটির আনুকূল্যে নিমেষে পাখীর মতন উড়িয়া পলাইয়া গেল,—একটি অমৃতময় স্পর্শের সুকোমল আভাস তাহার অধরে মুদ্রিত করিয়া দিয়া বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর নয়। রমেশ ইতিপূর্ব্বে ঘরে পাইচারী করিবার সময় আগামী কল্যের দার্জ্জিলিং যাত্রার কথাটা কিরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রতিভাকে বলিবে তাহারি মানসিক আবৃত্তি করিতে-ছিল। এখন সে শয়নাগারে আসিয়া পালঙ্কের উপর বসিয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল কি বলিয়া মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরদিবস দার্জ্জিলিং যাত্রার চুক্তিটি এড়াইবে। সকালে প্রাপ্ত তারক-দা'র চিঠিও তাহার পত্রপাঠ উত্তরের কথা মনে হইবামাত্র সে তারকের উদ্দেশ্যে বলিল, "তারক-দা," তোমারই জিৎ, আমার হার। তোমার চিঠি সেই আষাঢ়ের মেঘ, যার ছায়া পড়বামাত্র ঠন্‌ঠনে কালীতলায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়।"

পুনর্জন্ম

পরলোক-তত্ত্ব লইয়া সেদিন বার-লাইব্রেরীতে আমাদের তুমুল তর্ক চলিতেছে। ইহলোকে যাহাদের উদরান্নের জন্য ভাবিতে হয় না এবং এই পরাতৃপ্তির নিমিত্ত ইহসংসারে অন্য আকর্ষণের বা সহানুভূতির বস্তু যাহাদের বিশেষ কিছু নাই, তাহাদের মনে লোকান্তর সম্বন্ধে একটা কৌতূহল হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। মানুষ হয় ক্ষুধার তাড়নায় খোঁজে, না হয় একঘেয়ে পুরাতনের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্বাদ-বৈচিত্র্য সংগ্রহের জন্য উতলা হয়। এ সংসারে যে 'গোলামচোর' সে সঙ্গীর সন্ধানে ফেরে। যাহার "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ প্রিয়াশিষ্যা ললিতেকলাবিধৌ" তাহার অন্যত্র রশদসংগ্রহের আবশ্যকতা বড় একটা থাকে না। কিন্তু যার একতারায়,—তা' সে সোনার তারই হোক্ আর লোহার তারই হোক্—উদয়াস্ত একটিমাত্র সুরই কেবল বাজে, তাহার পক্ষে রাগ-বৈচিত্র্যের জন্য পরতান্ত্রিকতা অমার্জ্জনীয় বলিলেও অস্বাভাবিক বলা চলে না। আমাদের সেদিনকার পরলোক-চর্চ্চার ভিতর কতকটা ঐরূপ অনধিকারচর্চ্চার আনন্দ ছিল।

আমি বলিলাম, আমাদের দেহটি যন্ত্রবিশেষ। এঞ্জিনের কয়লার সঙ্গে আকাশের মুক্তবায়ুর যে দাহ্যদাহক সম্বন্ধ আছে, সেই যোগোৎপন্ন উত্তাপই বাষ্প সৃজন করে, চাকা ঘোরায়, পথ চালায়, বাঁশী বাজায়। সে বাষ্প বাহির হইয়া গিয়া যদি ঘাসের ডগায় শিশিরের বিন্দু হইয়া ঝোলে এবং সূর্য্যালোক ভাঙিয়া চুরিয়া রামধনুর রং বাহির করে এবং সেই রঙে আপনাকে অনুরঞ্জিত করিয়া হীরাপান্নার অনুকরণ করে, তাহাকে যে

নামই দাও না কেন, ষ্টীম-এঞ্জিনের প্রেতাত্মা বলিও না। আমাদের ভাবচিন্তাও উদারান্নেরই রূপান্তর মাত্র, হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকানি, মস্তিষ্কের রোস্‌নাই। জঠরানলে যদি ইন্ধন না পড়ে, নিঃশ্বাসবায়ু যদি প্রবেশাধিকার না পায়, মগজের দীপশিখা তাহা হইলে বিনা ফুৎকারে ভরা তৈলেই নিভিয়া যাইবে। সে অন্ধকার নিঙড়াইয়া একবিন্দু চেতনার কণা বাহির করিতে পারিবে না। মানুষের, শুধু মানুষের কেন, জীবমাত্রেরই পরকাল তাহার বংশধরের জীবনে, এবং তাহার সমসাময়িক অন্যান্য প্রাণীর প্রাণে, যাহাদের ভিতর সে নিয়তই আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। সেক্ষপীয়র, নিউটন, রবীন্দ্রনাথ তোমার আমার চিন্তায় নব নব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন করিতেছেন, এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে করিতে থাকিবেন।

ভাদুড়ী একটু ফিলজফার মেজাজের লোক। সে আত্মার অনন্ত পরমায়ু ও অনন্ত উন্নতির সম্বন্ধে বক্তৃতা সুরু করিয়া দিল। ঘোষ কিছুই মানে না, সুতরাং সকল মতামত সম্বন্ধেই সে একেবারে পক্ষপাতশূন্য। সে বলিল, যদি আত্মা বলিয়া দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা থাকে তাহা কেবল মানুষেরই পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, ও বস্তুতে সারা সৃষ্টির এজমালি অধিকার, ছারপোকা, মশামাছি হইতে আরম্ভ করিয়া অতিকায় হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই ওয়ারিশান। আমাদের দেশের জন্মান্তরবাদে যে এক ব্যক্তির অন্য জীবদেহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ব্যবস্থা বর্ণিত আছে সেটা কিন্তু আমার নেহাৎ মন্দ লাগে না। দোকানে গিয়া যেমন নিজের পায়ের মাপের জুতা কিনি, তেমনি আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে ঠিক মাপ-সই জীবদেহ ধারণ করিয়া নিজ নিজ চরিতার্থতা অর্জ্জন করা যাইবে এবং ইহলোকের অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মফলানুযায়ী সুবিধা-মাফিক দেহ ধারণ করিয়া আবার বারান্তরে অবতীর্ণ হওয়া যাইবে, এ 'আইডিয়া'টা আমার মন্দ লাগে না। তবে খট্‌কা লাগে এক জায়গায়। পূর্ব্বস্মৃতি

কোথায়? এই আমিই গত জন্মে প্রাংশুলভ্য দ্রাক্ষাগুচ্ছের বনে বনে ব্যর্থশৃগালের হতাশ্বাস বক্ষে ধরিয়া যে কুম্ভক যোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলাম, তাহারই পুণ্য ফলে ইহজন্মে কাচের ডিকাণ্টারের ভিতর সেই জন্মান্তরের বহু-ঈপ্সিত আঙ্গুরের রসধারাকে 'স্যাম্পেন'-সুন্দরীরূপে বন্দিনী করিতে পারিয়াছি এবং তাহাকে আমার দেহলোক হইতে চিত্তলোকের কোকিল-কূজিত কুঞ্জে অবাধে লইয়া যাইতে পারিয়াছি—ইহার প্রমাণ কি? এই বলিয়াই সে সম্মুখস্থ সোডা-হুইস্কির গেলাসের শেষ চুমুকটি নিঃশেষ করিল এবং বুকের পকেট হইতে সোণার সিগারেট কেস্‌টি বাহির করিয়া খুলিয়া আমার সম্মুখে ধরিল এবং একটি তুলিয়া লইয়া আপনার ক্ষৌরমসৃণ অধরোষ্ঠে ধারণ করিয়া পকেটে দেশলাই খুঁজিতে লাগিল। আমি তাহার চুরোটের মুখাগ্নি করিয়া সেই কাঠিতেই আত্মসৎকার করিলাম। ইত্যবসরে রায় বলিয়া উঠিল, আমি আমার মতামত কিছুই বলিব না, কেবল একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। ব্যাখ্যা তোমরা আপন ইচ্ছানুরূপ করিতে পার, আমার আপত্তি নাই।

রায়ের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বন্ধুমহলে যে কথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে বলিতে ভালবাসে তাহা আমাদের কবির জবানীতে—নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে, এই চরণটুকুতেই নিঃশেষে বলা হইয়াছে। রায় বি, এ পড়ার সময় চণ্ডীদাস-প্রদর্শিত পরকীয় চর্চ্চায় মনোনিবেশ করাতে তাহার পিতা কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলার হিসাবে, ফুটফুটে মুখ আর ফিক্‌ফিকে হাসিভরা, নোলকপরা একটি সরলা বালিকার সহিত জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেন, এই অস্ত্র-চিকিৎসার পরে বায়ু-পরিবর্ত্তনের আনুকূল্য দিবার জন্য তাহাকে পাঠান বিলাতে। সেখানে সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একতালা ডিগ্রির উপর অক্স্‌-ফোর্ড ডিগ্রির দ্বিতল প্রকোষ্ঠটি গাঁথিয়া তোলে এবং তদুপরি ব্যারিষ্টারের

বোরকা পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সে চোগার ফাঁকে বিলাতী কোটের বোতামের গর্ত্তে যে Forget-me-not-এর অদৃশ্য গুচ্ছটি সে ধারণ করে, সে পুষ্পোপহারিকার ফটো রায় আমাদের সকলকেই দেখাইয়াছে এবং তাহার হৃদ্‌যন্ত্র-ধৃত বহুপূর্ব্বের স্বদেশী ক্ষতের উপর বিদেশী মলমের গোলাপী প্রলেপটির পরিচয় আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পাইয়াছি। কবি-হৃদয়ের বেদনা সাধারণ সম্পত্তি, আমরা প্রায় সকলেই রায়ের হৃদয়-বেদনার অংশীদার সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষরূপে। তার রেশমী চাষের কাব্যগুটিকাগুলি রঙিন পাখা মেলিয়া বারলাইব্রেরীর সিগারেট-কুহেলিকায় উড়িয়া বেড়াইত এবং তাহার কাব্যলক্ষ্মী চরকা ও তাঁতের সাহায্যে ছোট ছোট রেশমী রুমাল বুনিয়া আমাদের মাঝে মাঝে উপহার দিতেন। সুতরাং অক্‌স্‌ফোর্ডের নলিচার আড়ালে যে আলবোলার অধর-চুম্বন রায়ের অবাধে চলিত, বর্ত্তমানে সে ধোঁয়ার ঐতিহাসিক মেঘমালা বারলাইব্রেরীর আকাশে আমাদের টেবিলের উপর মাঝে মাঝে ঘনাইয়া উঠিত। যাহা হোক্‌, রায়ের গল্প শুনিবার জন্য আমরা সকলেই উৎকর্ণ হইলাম।

রায়ের কাহিনী

গত বৎসর কোর্ট বন্ধ হলে আমি আর সেন কাছাড়ের হাফ্‌লং-হিল্‌ ষ্টেশনে গেলাম। সেনের সঙ্গে এ, বি রেলওয়ের বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ভাব ছিল। জানই ত, সেনের শিকারের নেশা কেমন, আর ওই পাহাড়ের নীচে ও আশে পাশে জঙ্গলভরা হরিণ, বাঘ, হাতী, যাকে বলে **Sportsman's Paradise.** জেটিঙ্গা নদী পাহাড়ের কোলে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে। সেখানে নিতান্ত আনাড়ির ছিপেও মাছ ধরা দেয়। ছেলেবেলা আমাদের গ্রামে মাছ ধরায় আমার জুড়িদার কেউ ছিল না।

তোমাদের পারলৌকিক বিচারের হিসাবে আমি আর জন্মে নিশ্চয়ই জেলের পো ছিলাম। তবে ইদানীং মাছের পরিবর্ত্তে মক্কেলের জন্য ছিপ ফেলে বসে থাকি—বৃত্তি একই। সেনের সঙ্গে ত গেলাম। পাহাড়ের উপর golf link এর পাশে একটি মাত্র হোটেল। বড় সুন্দর স্থানটি। চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ-এর পরে ঢেউ চলেছে। তারি একটা ঢেউ-এর উপর আমাদের ছোট হোটেলটি যেন একখানি নোঙর-করা জাহাজ। সেই ভূধর-তরঙ্গের একটির শৃঙ্গে আমরা আখড়া নিলাম। সেন তার সাহেব বন্ধুটির সহিত শিকারে বের হত। আমি কখনও বা জেটিঙ্গায় মাছ ধরতাম, কখনও বা আমাদের হোটেলের পাশে golf-link-এর কিনারায় বেঞ্চে বসে একখানা বই হাতে নিয়ে পাইপ টানতাম। চোখ-দুটো আকাশে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত, বই-এর পাতা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। দু'চার দিন পরেই এক চা-বাগানের সাহেব হোটেলে এসে জুটলেন, তিনিও শিকার-ভিক্ষু। তাঁর সঙ্গে ছিল একটা কুকুর, নেকড়ে বাঘের আয়তন তার। আমি অন্যমনস্ক হয়ে বেঞ্চে বসে আছি, এমন সময় কুকুরটি কোত্থেকে ছুটে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। পাৎলা ছিপ্‌ছিপে শরীর, ঘন চকোলেটের রং-এর তার রোমশ ছালখানি, মসৃণোজ্জ্বল অষ্ট্রীচের পালকের মত ল্যাজটি প্রায় লুটিয়ে পড়েছে। সরু লম্বা মুখখানি, বড় বড় কাণদুটি পুরু মখমলের পাতার মত দু'দিকে ঝুলছে। সে মুখ তুলে আমার দিকে একবার চাইল। তার চোখের সে কোমল দৃষ্টিতে তার বিপুল কায়ের বিভীষিকা আমার নিমেষে দূর হয়ে গেল। আমি কতকটা ভয়ে কতকটা নির্ভয়ে, কেন জানিনা, তাকে সেই নাম ধরে ডাক্‌লাম যার স্মৃতি তার চোখের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে জেগে উঠেছিল। সেই মুহূর্ত্তে কুকুরের ভাবটি যদি দেখতে। আমি যে তাকে চিনতে পেরেছি যেন সেই আনন্দে অধীর হয়ে এক লম্ফে আমার দুই কাঁধের উপর সামনের পা দু'খানি রেখে আমার উপর একটা

চুম্বনের প্রলেপ যেন মাখিয়ে দিল। তার মুখের তাড়নায় আমার চশমাটি ত ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঘাসের উপর গিয়ে পড়ল। অতি কষ্টে তাকে নামালাম। তারপর সে আমার চারদিকে অধীর উল্লাসে খুব খানিকটা দাপাদাপি করে আবার এসে আমার সম্মুখে সামনের পা দু'খানির উপর ভর রেখে বসল এবং উর্দ্ধমুখে সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখপানে চেয়ে রইল। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, হাতখানির উপর তার লেলিহান রসনা যেন একটি চুম্বনের দস্তানা পরিয়ে দিল। আমি জীবনে কখনও কুকুর পুষি নি, অথচ কোথা থেকে এ অজানা বিলাতী কুকুরটি আমাকে এমন করে দখল করে বসল, আমি দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। সবচেয়ে আমাকে উন্মনা করল তার চোখের সে আকুল দৃষ্টি। কত করুণা, কত মিনতি সে চোখে—সে দৃষ্টি আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করল। বহুদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং-এর Birch Hill-এর এক কোণে একটি কুকুরের গোর দেখেছিলাম। মনে পড়ে, পাথরের স্মৃতিস্তম্ভের নীচে লেখা ছিল :—

Here lies Jim, the faithful canine companion of a forest officer, who will ever mourn his loss.

আমার এক শালার একটি পোষা Irish Terrier কুকুর আছে। তিনি যখন সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে বাড়ী ফেরেন, তখন তার সেই কুকুরটির আনন্দোন্মাদ একটা দেখবার জিনিষ বটে। দিনান্তে শ্রান্ত গৃহস্বামী যখন ঘরে ফেরেন তখন তাঁর গৃহপ্রত্যাগমনে এমন হর্ষোচ্ছ্বাস স্বদেশে বা বিদেশে কোন গৃহলক্ষ্মীর চোখে মুখে ফোটে না। যদি বল সুসভ্য রমণীর আত্মসংযম আছে, তাঁর অনুরক্তি প্রকাশ এরূপ নির্লজ্জ নয়, তবে আমি বলি তাঁর বিরক্তির প্রকাশ তো উক্ত সরমা-সুন্দরীর চেয়ে কম মুখর নয় এবং তাঁর সুচারু হাত-নাড়ার কাছে এই অর্ব্বাচীন পশুর পুচ্ছ-আস্ফালন হার মানে। পতি পরম গুরু—একথা চিরুণী ত্রাসে

লেখা না থাকলেও এর হাড়ে হাড়ে লেখা। ঘরদোর আগলাতে, চোর তাড়াতে, বিপক্ষের কাছে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতে, ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে, প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে কজন দ্বিপদী এই চতুষ্পদীর সমকক্ষ হতে পারে?

যাহোক্, আমাদের দু'জনার মধ্যে যখন উদার আকাশের তলে প্রণয়ের মূকাভিনয় চলছে, এমন সময় কুকুরের মালিক হোটেলের বেড়ার ফাটকের কাছে এসে ডাক দিলেন—Mimsi, my darling! সে একবার উচ্চকিত হয়ে হোটেলের দিকে তাকাল, তারপর আমার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। তার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হয়ে তার প্রভু আমার বেঞ্চের কাছে ছুটে এলেন, Mimsi উঠে দাঁড়াল, তার ল্যাজ মাটিতে উলুখড়ের ঝাঁটার মত লুটিয়ে পড়ল। আমি সাহেবকে তাব কুকুরের সুখ্যাতি করলাম। সে বলল, আমার কুকুর অজানা লোকের ত্রিসীমায় যায় না, তোমার সঙ্গে ত দেখছি দিব্যি দোস্তি। শিকল পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সে বিনা আপত্তিতে পিছন পিছন চলল, একটিবার ফিরে তাকাল না।

পরদিন সকালে সাহেব তাকে নিয়ে শিকারে বার হলেন। আমি, সেন ও ইঞ্জিনিয়ার তাঁর সঙ্গে চললাম। পথে কুকুরটীর সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হল। তাকে তিনি দুই বৎসর হল বিলাত থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এখন তার বয়স পাঁচ বৎসর সাত মাস। ঠিক পাঁচ বৎসর সাত মাস আগে যার চক্ষে এর দৃষ্টি দেখছিলাম তার কথা মনে হল। তখন আমি অক্স্ফোর্ডে। আমি জেটিঙ্গার তীরে ছিপ নিয়ে বসলাম, সেন সাহেবদের সঙ্গে চলে গেল, শিকারের সন্ধানে। ফেরবার পথে আবার তাদের সঙ্গে ফিরব, এই কথা রইল। ঘণ্টাখানেক মাছ ধরবার পর ছিপ রেখে পাইপ ধরাচ্ছি, এমন সময় দেখি Mimsi একটি partridge মুখে করে বনের ভিতর থেকে আমার

কাছে ছুটে এল। পাখীটি মাটিতে রেখে আমাকে বারদুই প্রদক্ষিণ করে আমার কোলে মাথা গুঁজল, তার লেহনের আলিপনে আমার হাত মুখ ভরে গেল। আমি তার মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলাম। তারপর সে নিঃশব্দে আমার পাশে বসে আমার মাছ ধরায় যোগ দিল। যে প্রিয়জন, সে পাশে বসলে চাঁদের জ্যোৎস্নায় জোয়ার লাগে, আকাশের নীলিমা গাঢ়তর হয়, বনশ্রীর মুখে লাবণ্য উথলে ওঠে। অজানা সাহেবের অচিন কুকুরটি আমার পাশে বসে রইল, জেটিঙ্গার জল-কল্লোল কাণে বড় মধুর লাগল, প্রত্যেক টোপটি অব্যর্থ-সন্ধান হল, আকাশে বাতাসে সূর্য্য-কিরণে বনের স্তব্ধতায় এক অপূর্ব্ব আনন্দরসের প্লাবন যেন বয়ে গেল। মানুষ আসলে বড় নিঃসঙ্গ, তাই সে যখন সঙ্গী পায় সমস্ত জগৎকে সে তখন বড় নিকটে পায়। সে সঙ্গী যেই হোক্—মানুষ পশু বা পক্ষী—তাতে কিছুমাত্র আসে যায় না, যদি জানি সে আমাকে চায়, আমার দরদী। আমি ছিপ ফেলে দু'হাতে তার সুকোমল কাণ-ঢাকা গণ্ডস্থলটি ধরে তার চোখের অন্তস্তলে চেয়ে রইলাম। স্বচ্ছ চোখ দুটি আকাশের আলোয় ভরে উঠেছে। অতলস্পর্শ! সে অতলে ডুবতে পারলে কি তার পূর্ব্ব জন্মের কোন অভিজ্ঞান, কোন নিদর্শন উদ্ধার করতে পারব? আমার অনেক দিনের অপলক দৃষ্টি কি ওই চোখের অতলে লুকিয়ে আছে? আত্মা—প্রাণ—চেতনা কি ঈথরের ঘূর্ণী জড়ের বেষ্টনে? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রাণের আবর্ত্ত একটি নারীর বক্ষে রক্ষিত ছিল আজ কি সেই ঘূর্ণীপাক এই মূকপ্রাণীর প্রাণে আপনার ঘূর্ণীকেন্দ্রটি সরিয়ে এনেছে? মাছধরা বন্ধ করে আমার অচেনা সহচরীর কণ্ঠালিঙ্গনে নদীর তীরে নীরবে বসে রইলাম। কতক্ষণ জানিনা, যাকে পাঁচ বৎসর হল জন্মের মতন হারিয়েছিলাম, তাকে আবার যেন ভুজবন্ধনের ভিতর ফিরে পেলাম।

অদূরে বন্দুকের শব্দে আমরা দু'জনেই চম্‌কে উঠলাম। আমার

বাহুগ্রন্থি নিমেষে স্খলিত হল, Mimsi ছুটে সেই দিকে চলে গেল। মিনিট দশেকের পর শিকারীর দল ফিরে এল। Mimsi পালিয়ে এসে এতক্ষণ কার সঙ্গে কাটিয়েছে, ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্তবক্ষ partridgeটি নীরবে তা বলে দিল। কুকুর নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও প্লাণ্টারে আমার খরচায় কিঞ্চিৎ রসিকতা হয়ে গেল এবং সেনও ছেড়ে কথা কইল না। ইঞ্জিনিয়ার তার চা-কর বন্ধুটিকে বললেন, আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে মিম্‌সিকে এখনি তালাক দিতাম। আমি বললাম, তাহলে আমি এখনি কল্‌মা পড়ে শ্রীমতীকে নিকা করতে প্রস্তুত। চা-কর বলল, রায়ের সঙ্গে আমার duel, তোমরা দুজন Seconds বা সাক্ষী রইলে।

সেদিন রাত্রে ডিনারের সময় Planter হোটেলের ম্যানেজারকে বললেন, আমার বিল দিয়ে যাও, কাল ভোরেই আমি চলে যাব। আগে শুনেছিলাম, তিনি আরও এক সপ্তাহ থাকবেন। সেন আমাকে চিম্‌টি কেটে চুপি চুপি বল্‌ল, ও নিশ্চয়ই তোমার ভয়ে পালাচ্ছে। আমি বললাম—'None but the brave deserves the fair.'

রাত তখন দু'টা হবে। দূরের পাহাড়ের জঙ্গলে হরিণ ডাকছিল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কি অদ্ভুত সে ডাক। শিকারীদের সঙ্গে না থাকলে সে যে হরিণের ডাক তা জানতে পারতাম না। আমার বিছনার উপর নিশিশেষের চন্দ্রকলা তার ক্ষীণ তরল জ্যোৎস্নাধারা ঢেলে দিচ্ছিল, প্রৌঢ়হৃদয়ের নীরব প্রেমের মত। হঠাৎ আমার দরজায় একটা মৃদুশব্দ শুনতে পেলাম। উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, Mimsi থেকে থেকে নখ দিয়ে দরজা আঁচড়ে খোলবার চেষ্টা করছে। আমি দরজা খুলে খাটের উপর উঠে এসে বসলাম, সে একলম্ফে বিছানার উপর উঠে বসল। তার মুখে চাঁদের আলো পড়ল, তার চোখ থেকে একটা নীলাভ জ্যোতি ঠিক্‌রে পড়ল আমার চোখে। লাল জিভটি একবার আমার গালে মুখে বুলিয়ে, মাথাটি আমার কাঁধের উপর রেখে গা

ঘেঁসে বসে রইল, আমি তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। কিছুক্ষণ পরেই বাইরে পদধ্বনি শুনলাম। তারপরই সাহেব শিষ দিয়ে ডাকল "Mimsi, Mimsi, you naughty girl!" আমি ঘরের ভিতর থেকে হাঁকলাম, "Come in, she is with me." সাহেব ঘরে এসে আমাদের দু'জনকে তদবস্থ দেখল। আমি তাকে সম্মুখের চেয়ারে বসতে বললাম এবং অভিসারিকার কুঞ্জদ্বারে করাঘাতের কথা বললাম। অন্ধকারে সাহেবের মুখ অস্পষ্ট হলেও তার ভাষা বেশ সুস্পষ্ট। তার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হল তা তোমাদের না বললেও চলে, তবে তার কথায় ভরসা পেয়ে আমি বললাম যে, অনুমতি পেলে আমি Mimsiর সাত্বধিকারের মূল্য আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত একখণ্ড চেকপত্রে লিখে দিতে পারি। সাহেব বললেন, তোমার যা খুসি লিখতে পার। আমি তৎক্ষণাৎ আমার Electric Torch বাতিটা জ্বালিয়ে চেক বার করে, Mimsiর মর্য্যাদা হানি না হয় এমন একটি সংখ্যা লিখে দিলাম। সাহেব ধন্যবাদের সহিত চেকখানা নিয়ে আমার করমর্দ্দন করে বিদায় নিলেন। অল্পক্ষণ পরেই আবার দরজায় টোকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভিতরে আসতে পারি কি?" আমি সানন্দে ডাকলাম। তিনি এসে আমার বিছানার উপর Mimsiর শিকলটা রেখে Good-bye বলে চলে গেলেন। পরদিন সকালে ঘর থেকে বার হবার সময় দেখি চেকখানি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে দরজার সামনে পড়ে আছে। সে শিকলটা কিন্তু হোটেলেই ফেলে এসেছিলাম।

গ্রন্থকারের অন্যান্য কয়েকখানি

=কাব্যগ্রন্থ=

ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

ব্রাউনিঙের কবিতাগুলিকে তুমি যে সংস্করণ দিয়েছ তা অপরূপ হয়েছে। তাতে অনুবাদের ক্লিষ্টতা লেশমাত্র নেই, তাতে যেন নবজন্মের নূতন শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্র দত্তের অনুবাদে ছন্দোবিহঙ্গের সহজ লীলা দেখা যায়, কিন্তু তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। বিদেশী রসদ্রব্যের ভার নিয়ে তুমি একঘাট থেকে আর একঘাটে খেয়া দিয়েছ দুর্গমতম উজান পথে, দুঃসাহসিক নাবিকবৃত্তিতে এরকম কৃতিত্ব দেখা যায় না।

ইতি ২৪/১২/৩৩

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ২৲

শতপর্ণী

সনেট শতক

এই সনেটগুলি

সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন—

"তোমার এই কবিতাগুলি পড়ে শ্বেতভুজা ভারতীকে আবার মনে পড়ে গেল। এঁর আকৃতিতে ও গতিতে যে সংযত গম্ভীর মার্জ্জিত সুন্দর আভিজাত্য প্রকাশ পায় তাকে অভিবাদন করতে হোলো।......তুমি লিখেছ—

পবনের সম্মার্জ্জনী যতনে করিবে বহিষ্কার
আঙিনার আবর্জ্জনা, সোনার ফসল শুধু রবে। (৩৫ পৃষ্ঠা)

তোমার সেই ফসল ফলেছে। ওর সঙ্গে অপরিণত কিছু মিশিয়ে যায়নি। সোনার ফসল কাটা শেষ হয়ে গেলে পর হয়ত সেই ক্ষেতে সময় আসবে অযত্নের মেঠো ফুল ফোটাবার। সে মানাবে সূর্য্যাস্ত আকাশের বিলীয়মান বর্ণচ্ছটার সঙ্গে, সম্মার্জ্জনী তাকে লক্ষ্য করবে না।"

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ১৷৷০

পর্ণজা

বইটি সম্বন্ধে

রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন—

.. .."তোমার এই গদ্য কাব্যগুলি রীতিমত গদ্যও হয়েছে কাব্যও হয়েছে, এবং সম্পূর্ণ তোমার ছাপমারা সামগ্রীও হয়েছে, ভাল করেই প্রমাণ করতে পেরেছ যে গদ্যের সঙ্গে কাব্যের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক নয়।......আর একটা উপমা আশ্রয় করে বলা যায় তোমার প্রথম-জাত মেয়েটির চেয়ে তোমার এই কনিষ্ঠ ছেলের গৌরব বেশি, একে বলালেই হোলো, সাজাবার দরকার নেই।".........

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,

কলিকাতা।